মূর্ছনা
==========
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
==========
suman_ahm@yahoo.com

আমার এই অপরাহ্ণ রেখা

মৃণাল চক্রবর্তী

পর্ব ১

এখানে এই মাঠের কাছে বসে যদি উল্টোদিকে তাকাই, তবে দেখি কাশীপুর গ্রামের তাল গাছের ঘেরাটোপে সবুজ রেখাটুকু। নদী এতই ছোট এখন যে সব স্পষ্ট দেখা যায় কিন্তু বাড়িঘর দেখা যায় না। মানুষদের ছায়াও দেখা যায় না। তাই বোধহয় আমার মনে হয়, গ্রামটা অন্যরকম। ওখানকার লোকেরা যেন সব ছায়ার জগতে থাকে। সেই গ্রাম থেকে একজন আশ্চর্য লুঙ্গি পরা যুবক আমার ভাবালু দুপুরে একদিন নেমে আসে কী কায়দায়। যেচে আলাপ করে আমার সঙ্গে। আমার কাশীপুর রহস্যের শরিক হয়ে সে নানান গল্প বলে আমাকে। দারুণ মজার গল্প ছিল নিশ্চয়, না হলে আমি তার পরবর্তী প্রস্তাবে রাজি হব কেন ? সে বলে একদিন আমাকে কাশীপুর নিয়ে যাবে

নৌকো করে যদি আমি ছোড়দিকে একবার তার কাছে নিয়ে আসতে পারি এইখানে এরকম দুপুরবেলায়। মুজাফ্‌ফর নামের সেই যুবক এইসব শলা-পরামর্শ শেষ করে চলে যায় পড়ন্ত দুপুরে। তাকে আমি কথা দিই, তবে সে বলে না কোথায় বাঁধা আছে তার ডিঙা যাতে চড়ে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে কাশীপুরের দিকে। এক সময় নদীর ধারের জঙ্গলে সে হারিয়ে যায়। আমাদের পারিবারিক শ্মশান এখানে। হন্যমান মানবশরীরের ছাই-এর ওপর তৈরি একটা মঠ।

বাড়ি ফিরে ছোড়দিকে এই দারুণ প্রস্তাব দিতে সে আমায় সপাটে থাপ্পড় মারে। আমি এই বিশ্বাসঘাতকতায় স্তম্ভিত। যাকে আমি এই দুর্লভ যাত্রা সঙ্গী করতে চেয়েছিলাম, সে আমায় মারল। সাত বছরের কুট্টিকে মারল পনের বছরে বুলা। বাড়ি মাথায় করে কাঁদি আমি। মার কাছে এসে বলি এই ভয়ানক নৃশংসতার কথা। মার ভাবগতিকও সুবিধার মনে হয় না আমার। ছোড়দিকে চুলের মুঠি ধরে যে বেদম গ্রাম্য মার, সেটাকেও মনে হয় না অন্যায়ের যোগ্য প্রতিবাদ, সঙ্গত প্রতিবাদ। মনে হয় মা অন্য কোনও কারণে মারছে ওকে। এরপর থেকে মঠের কাছে যাওয়া বন্ধ হয় আমার। কীভাবে যেন জানা যায় মুজাফ্‌ফরকে বজু খুব মেরেছে। কল্পনায় ক্ষতবিক্ষত সেই যুবকের মুখ মনে পড়লেই খুব কষ্ট হত তখন। পরে তাকে আর দেখিনি।

জোলোজমি আর জঙ্গলের এই সবুজ পরিবেশে একজন মাঝে মাঝে আসে আমাদের জীবনে। সকালে দাঁত মাজে টুথব্রাশে। আমরা আঙ্গারে মাজি। গান শোনা যায় -- খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি। একদম বদলে যায় পরিবেশ। নদীর ধারে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যায় সে, একটা সিগারেট ধরায়, আবার রবীন্দ্রনাথ -- ওগো নদী, আপন বেগে পাগল-পারা। অবশ্য সেই নদীর পাগল-পারা অবস্থা আমি দেখিনি। শীর্ণা সেই গরিব নদী আমার বড়দাকে, যে কিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির মেধাবী ছাত্র, যে কিনা সংস্কৃতি এবং নৈতিকতার পরাকাষ্ঠা তাকে স্নেহবশত দু-চারটে ভাঁজ দেখিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে যায়।

বাবু, তের-চোদ্দ বছরের এক বালক যে জাম্বুরা দিয়ে ক্রিকেট খেলে এবং আজিম যার প্রিয় অভিনেতা, সে অবশ্য তার জীবন নিয়ে দিব্যি আছে। পাশাপাশি জসিমউদ্দিনের 'এইখানে তোর দাদির কবর' শুনিয়ে দুলাল চক্রবর্তী হিরো। কী অ্যাক্টিং তার। পুরো মুখস্ত বলছে আবার অ্যাক্টিং-ও করছে। তখন আবৃতি করাটা ছিল বেশ নাটকীয়। ডালিম গাছ, কবরের সম্ভাব্য জায়গা, চোখের জল -- এসব দেখিয়ে, এমনকী বিমূর্ত বিষয়কেও যেমন হাহাকার, আকুতি, প্রেম (রসালো আলিঙ্গনোদ্যত), ক্রোধ (কটকটে চোখ, উদ্যত ডান হাত, আমি কোনও বাঁ-হাতি আবৃত্তিকার দেখিনি) এমন বিভঙ্গে দেখাতে হত যাতে কিনা মানুষের হৃদয় মথিত হয়। ছোড়দার এই হিরোইক জায়গাটাও সামন্ত্রতান্ত্রিক কিন্তু বেশ মজার। বড়দি সুন্দরী ছিল, তাকে দু-একবার যদু মাস্টারের কাছে মৃদু লাঞ্ছিত হতে দেখেছি। পড়াশোনায় ভাল ছিল না সে। পরে মনে হয়েছে ওই

সব মৃদুপ্রহারে যদু মাস্টার যৌন আনন্দ পেতেন। কত বছর পরে যেন শুনেছিলাম তিনি বড়দিকে কোনও কুপ্রস্তাব দেন। বেঁটে কালো রোগা এই ভদ্রলোককে নিয়ে ছোড়দা নানান ঠাট্টা করত আড়ালে। উনি বেঁচে আছেন কিনা জানি না। সারা জীবন আমাদের উপকার করে গেছেন নানাভাবে। বড়দির ঠিক পরেই ছোড়দি, মানে কিনা বুলা, প্রতিমা, পরে নামান্তর হয়, আমার মনে হয় একটু সদ্য যৌবনোদগমে কস্তুরী হরিণের মতো ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ওখানকার যুবকদের নজরে পড়ে। মার ছোড়দিকে পূর্বকথিত মার দেওয়ার সঙ্গে ওর তৎকালীন চপলতার কোনও যোগাযোগ ছিল হয়তো। আমার কাছে এই পুরো ব্যাপারটাই ছায়া-ছায়া। সবই লুকিয়ে যাওয়া হত আমার কাছে। একবার যেমন বড়দির বিয়ের পর পরই আমরা পালং-এ সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। ছোড়দি কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না আমাদের সঙ্গে যেতে। তখনকার অনেক বাড়িতেই সিলিং-জোড়া একটা ভাঁড়ার গোছের থাকত, তাকে বলত 'কার'। সেই কার উঠে লুকিয়েছিল সে। আমাদের রঙ্গিলা জামাইবাবু সেই কারে উঠে তাকে খুব কাকুতি-মিনতি করা সত্ত্বেও ছোড়দি নামেনি। মা গভীর চিন্তায় থেকে গিয়েছিল বাড়িতে।

থেলো হুঁকো হাতে যে বৃদ্ধ বাড়ির উঠোন, পুকুর বা আমবাগানে ঘুরে বেড়াতেন, তিনি অতুলচন্দ্র, মেজদাদু। এঁর জীবন অসামান্য রোমান্টিক। নিজের পক্ষে, কিন্তু বিজড়িত মানুষদের পক্ষে ভয়াবহ। এমনটা বার বার পড়েছি গল্পে, ছোটবেলায় মেজাদাদুকে দেখার পরে ঘটনাগুলো বুঝতে অসুবিধা হয়নি। তবে একটা কথা মনেও রাখতে হবে যে এসব আলোছায়া চরিত্রদের বোঝার পক্ষে আমি তখন খুবই ছোট। পরে কিছুটা গল্প শুনে আর কিছুটা কল্পনায় এদের নির্মাণ করেছি আমি। কলকাতার মতো এক স্বপ্নের দেশে, যেখানে আমার স্বপ্নিল কাকুরা থাকে, তাদেরই মধ্যে একজন বিল্টুকাকু, মেজদাদুর ছেলে। তার মা, মেজদাদুর স্ত্রী, বেঁচে নেই এখন। অনেক দিন ধরেই সে মামাবাড়িতে বড় হচ্ছে। অথচ মেজদাদু এখানে মালকোষে গৎ ধরে পুকুর পরিদর্শন করছেন। এই চিন্তায় এতটুকু বিস্ময় ছিল না এমন নয়, তবে শুনেছিলাম কোনও এক কালে বিল্টুকাকু, তখন ভরা যুবক, দেশে এলে বাবা-ছেলে আনন্দঘন মুহূর্ত কাটিয়েছিলেন। তারপর বিল্টুকাকু ফিরে যায় কলকাতায়। মেজদাদু যান না। থেলো হুঁকো হাতে ঘুরে বেড়ান বাড়ির ন, আমাকে কোলে তুলে নিয় যত্রতত্র কুট্টি মহারাজ বলে হাঁকডাক করেন। একমাত্র সুপুরুষ চেহারাটি ছাড়া এঁর মধ্যে কোনও আভিজাত্য দেখিনি কখনও। অজাতশত্রু মেজদাদু এই পরিবারের গলগ্রহ ছিল মনে হয়। সবাই তাই ছিল। একমাত্র বাবাই সংসার চালানোর তাগিদে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াত। কী করে চালাত আমি জানি না। বোধ হয় মামলা-মোকদ্দমা বাধিয়ে।

ননীগোপাল চক্রবর্তীর অভিনয়ে খুব ঝোঁক ছিল। প্রবাদ বলে, সে যৌবনে কলকাতায় চলে গিয়েছিল নাটকদলে যোগ দিতে। এর পেছনে কোনও এক কলকাতাইয়া অভিনেতার পিনিক ছিল মনে হয়। যে হয়তো কোনও কারণে দেশে এসে কোনও গ্রাম্য ঐতিহাসিক নাটকে বাবার অভিনয় দেখে বাবাকে ইঙ্গিত দিয়েছিল যে কলকাতায়

গেলেই বাবা অভিনেতা হিসেবে বিপুল খ্যাতি পাবে। শোনা যায় রায়সাহেব নিজস্ব লাইসেন্স-প্রাপ্ত রিভলভার ইত্যাদি নিয়ে কলকাতায় এসে বাবাকে সগর্জনে তুলে নেন, গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যান। এর পর বাবার বিয়ে দেওয়া হয় ঝিকরকাঠির লীলা ভাদুড়ির সঙ্গে। মায়ের বাবার নাম শিশির ভাদুড়ি। শুনেছি যে তিনি দরিদ্র বামুন ছিলেন। পরে যেন কবে মা বলেছিল, বিয়ের আগেই তাদের বাড়িতে ডাকাতি হয় এবং যেটুকু টাকা ইত্যাদি পণবাবদ ছিল, তা এবং সামান্য গয়নগাঁটি সাফ হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও রায়সাহেব এই বিয়ে দেন। আমার মা, যার ডাকনাম ছিল চাঁপা, যে এই ক-দিন আগে মারা গেল অনেক অনেক ভুগে, তার উনিশ বা কুড়ি বছর বয়সে ঢোকে আংগারিয়ার চক্কোত্তি বাড়িতে। নিজের ছেলেকে স্থিতধী করতে গিয়ে রায়সাহেব দুটি মানুষকেই হত্যা করেন। বাবা-মার বিয়েতে দান্দার প্রতাপে লালমুখো সাহেবরাও এসেছিলেন শুনেছি ওই প্রত্যন্ত গ্রামে। এমনকী আমিও সেই প্রবাদপ্রতিম বিয়ের গল্প শুনে বড় হয়েছি আভিজাত্যের মায়ায় ঢাকা দারিদ্র্যের মধ্যে। তখন পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমানেরা সংখ্যাগুরু। যে ব্যবধান হিন্দুরা তৈরি করেছিল বহু বছর ধরে, তার শাস্তি পেতে হতোই। আমরা পেয়েওছিলাম।

পর্ব ২

জন্মের সময় আমার নাম রাখা হয় লাবণ্যকান্তি চক্রবর্তী। আঙ্গারিয়া মডেল প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময় কারা যেন নাম নিয়ে খুব পেছনে লাগে। এই সব নামকরণ হতো ঠিকুজি-কোষ্ঠী মিলিয়ে। নামকরণ করতেন দান্দা, পিতামহ রায়সাহেব জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এক বিষণ্ন দীর্ঘশ্বাসের মতো রায়সাহেব উপাধি বরাবর থেকে গিয়েছিল দান্দার। এমনকি বহু দিন পরে যখন খেলাৎ বাবু লেন-এর এক অকিঞ্চিৎকর অন্ধকার ঘরে মারা যান এই পেট্রিয়ার্ক-টার্নড রিফিউজি, তখনও তাঁর বেডসোরে ভরে যাওয়া শরীরে কীভাবে যেন রায়সাহেব শিরোপাটি থেকে গিয়েছিল। যাই হোক, পূর্ব পাকিস্তানের সেই লাবণ্যলাঞ্ছিত সন্ধেবেলা দান্দা শুয়ে ছিলেন বিছানায়। নাতিদের অবারিত দ্বার ছিল। আমি কাঁদতে কাঁদতে আমার হেনস্থার কথা জানালে কিছুক্ষণ চিন্তা করে অবশেষে পেট্রিয়ার্ক রায় দেন, তাহলে নাম হোক মৃণাল। এর সঙ্গে উনি কান্তি জুড়লেও আমার মনে নেই। সেই কান্তি অধরাই থেকে গিয়েছে। ছোড়দাও কলকাতায় এসে দুলালকে ত্যাগ করে নাম নেয় 'দেবাশীষ'। একাত্তর সালে যখন আমরা ভারতে আসি, তখন আমার বয়েস কত, এ-বিষয়ে কারও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। অর্থাৎ আমি জানতাম না আমি ৬১, ৬২ নাকি ৬৩ সালে জন্মেছি। এই তিনটেই সম্ভাবনা ছিল। মা শুধু জানতো ২৩শে চৈত্র। এ বিষয়ে আলোকপাত হয় বেশ কয়েক বছর বাদে। আমিই ছিলাম তদন্তকারী।

নর্দান এভিনিউ থেকে ফেরার পথটা ছিল গোলমেলে। কারণ ঠিক মোড়েই বিপদের আশঙ্কা ছিল। প্রণব বলে একটা ছেলেকে আমি খুব ভয় পেতাম। সে উল্টোদিকের একটা গলির মোড়েই আড্ডা মারত। আমারই সমবয়েসি হবে, বা কিছু বড়। মনোহর একাডেমিতে আমার সঙ্গে পড়ত সে। আমাকে নানান ভাবে ভয় দেখাত প্রণব। ওর কাছ থেকে আমি টাকা ধার নিতাম মাঝেমধ্যে। বিচিত্র সুদে। এক টাকা ধার নিলে দিতে হত দেড় টাকা। যেহেতু প্রায়ই আমি তা দিতে পারতাম না, তাই আমাকে বাড়ির ঘটি-বাটি তাকে গোপনে দিয়ে দিতে হত। কাসার বা পেতলের সে-সব বাটির বিনিময়ে আমি রক্ষা পেতাম প্রণবের হাত থেকে। কিন্তু সব সময় ভয় করত। দুপুরবেলা হয়তো আমাদের খেলাৎ বাবু লেনের একতলার জানালার পাশে শোনা যাবে প্রণবের গলা, 'মৃণ-অল'। দান্দা তখনও ঘুমিয়ে। হয়তো স্বপ্ন দেখছে বাড়িতে ব্রিজের আড্ডা বসেছে। হয়তো ভাবছে, রায়সাহেব রায়সাহেব ধ্বনিত হচ্ছে জগন্ময়। এসব সময়ে আসত প্রণব। তখন আমার সুন্দরী যুবতী দিদি আমাদের সঙ্গে আছে। হয়তো উঁকি মারত তাকে দেখতেও। আর আমি যথাসম্ভব লুকিয়ে বের করে দিতাম একটা ছোট কাঁসার থালা। প্রণবের মধ্যেই আমি প্রথম অভ্যুত্থান দেখেছিলাম যৌনতার। বেলগাছিয়া ব্রিজের নীচে মনোহর একাডেমি-তে ক্লাস ফোর-এ প্রণব আমার সহপাঠী ছিল। সে মানবেন্দ্র নামের আরেক সহপাঠিকে পেছন থেকে ধরে কোমর দিয়ে দিয়ে দোলাত আর বলত, 'আমার মানি, আমার হেমা মালিনী'।

কিন্তু মাঝে মাঝে সব ঝাপসা হয়ে যায়। চল্লিশ পেরনোর পর থেকে এমন হচ্ছে। বর্ষায় বাড়িতে সাঁকো বাঁধা হত। বিভিন্ন ঘরকে জুড়ে উঠোনময় তৈরি হত বাঁশের পোল। যেই না শুরু হল টিপটিপ বৃষ্টি অমনি কলাগাছের ভেলা আর সাঁকোর মাধ্যমে এ-ঘর থেকে ও-ঘর যাতায়াত। দান্দার ঘর ছিল নতুন ঘর। ওই ঘরের সামনেই এক বিকেলে বসেছিল জমায়েত। পাকিস্তানি মিলিটারি তখন দ্রুত আক্রমণ করছে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তাদের পথ দেখাচ্ছে রাজাকরেরা। মুড়ি-নারকোল খেতে খেতে শপথ নেওয়া হয়েছিল যে এ গ্রামে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধবে না। করিম মিয়া বলেছিলেন, হিন্দুদের জমি বুক দিয়ে আগলাবেন। না হলে তিনি কাফের। তারপর চা এল। রায়সাহেব জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নিশ্চিন্ত হলেন। নিশ্চিন্ত আমরা সবাই। ননীগোপাল চক্রবর্তী বিশ্বাসই করতেন না যে কিছু ঘটতে পারে। চাপা উৎকণ্ঠা আর অফুরন্ত বিশ্বাস নিয়ে ঘুমোতে গেল সারা বাড়ি। ইতিহাস চোখ মারল অতর্কিতে। তখন গোটা পরিবার মিথ-এ বিলগ্ন।

কোনওদিনই কিছু হইব না -- এই সোহাগী-বিশ্বাসের হাত থেকে প্রথম পালান আমার কাকারা। পাঁচের দশকে কলকাতায় এসে পড়াশোনা করেন তাঁরা। তাঁদের মেসবাড়িতে থাকা, সেখানকার জীবনযাত্রা, প্রাক-রিফিউজি অবস্থায় মধুময় মনে হত। এরকম মেসবাড়ির কত গল্প পড়েছিলাম। বড় কাকা অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর মুখ মনে পড়লেই এক শেষ দুপুরে বনগাঁর রাস্তায় হেঁটে চলা উদ্বাস্তুদের দঙ্গল নেমে আসে ছোট আট-ন বছরের ফ্রেমে। কাদের সঙ্গে যেন এলাম আমরা ? সারা জীবন আর

দেখা নেই। অতগুলো মানুষ আর সেই দালাল -- গোবিন্দ -- যার ওপর দায় ছিল বর্ডার পার করিয়ে দেওয়ার ? দালালেরা সব গণতান্ত্রিক দেশেই বেশ জাঁকজমক করে থাকে দেখেছি। গোবিন্দও নিশ্চয়ই যেপার বাংলাতেই থাক, ভাল আছে। মানুষগুলো কিন্তু অনেকদিন আমাদের সঙ্গেই ছিল। কোথাকার কোন মফঃস্বলে হারিয়ে গেছে তারা কে জানে। একজনের এক ধূসর পোস্তকার্ড পেয়েছিলাম লতাফাৎ হোসেন লেনে। খড়দা থেকে হারিয়ে যাওয়ার আগে একটা এস-ও-এস মনে হয় সেটা। যদি ঠিকানা এবং রাস্তার বর্ণনা দেন, পৌঁছতে পারি। জানি না সে-ঠিকানা পাঠানো হয়েছিল কিনা। মুছে যাওয়ার আগে কিছু মানুষ, শেষবার খড়দা-কোন্নগরে দরিদ্র আত্মীয়দের উঠোনে বসে এক ফাঁকা-ফাঁপা ভবিষ্যতের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার আগে এরকম কয়েকটা পোস্টকার্ড ছেড়ে গিয়েছিল। এটা আমাদের রিফিউজি লাইনের দ্বিতীয় পর্ব। বেলেঘাটা, ১৯৭১।

পর্ব ৩

সকালে আশ্চর্য পাঁউরুটি সেঁকার গন্ধে ঘুম ভেঙে গেলে বুঝতে হবে কেউ এসেছে শহর থেকে। হয় বরিশাল থেকে সুধীরদা, বা ঢাকা থেকে বড়দা। বা অন্য কেউ। কিন্তু যে এসেছে তার গায়ে লেগে আছে শহরের গন্ধ, মানে কিনা পেট্রলের গন্ধ, যেমনটা কিনা শুনেছি বাসের গা থেকে বেরোয়। স্মৃতিতে পাঁরুটির আর পেট্রলের গন্ধ একই সঙ্গে মিশে আছে। প্রথম নদী পেরনো মাদারিপুর যাওয়ার সময়। সম্ভবত আরিয়ল খাঁর এক শাখা নদী বয়ে যেত গ্রামের পাশ দিয়ে। তখন তার ওপর দিয়ে লঞ্চ যেত শুধু। কিন্তু গল্প শুনেছি, একদা স্টিমার যেত। নদী পার হয়েই মাদারিপুর যেখানে প্রথম দেখি বাস। ভোঁতকা মুখের, অনেকটা আজ থেকে কুড়ি বছর আগের কলকাতার স্কুল-বাসের মতো দেখতে, ওই বাসগুলোর গা থেকে বেরতো মদির পেট্রলের গন্ধ। ওই ধরনের বাস অবশ্য কলকাতায়ও এসে দেখেছিলাম -- ৩বি, ৭৮সি এইসব। এখন বুঝতে পারি ঝাপসা দৃশ্যগুলোকে মিলিয়ে যে মাদারিপুর ছিল ছোটখাটো একটা গঞ্জ। দুবার সেখানে যাই আমি। দুবারই মা আর মেজদাদুর সঙ্গে। এর মধ্যে একবার সম্ভবত বড়দির বিয়ের জন্য। গোপালগঞ্জ যাওয়ার পথে। আর অন্যবার কেন যে গিয়েছিলাম জানি না। ওখানে দুটো সিনেমা হল ছিল -- মিলন আর বাদামতলী। বাদামতলী কিছুটা অখ্যাত ছিল কারণ ওখানে 'ডায়নামাইট' জ্বলত আর ছবি কাঁপত থরথর করে। মিলনে কী করে ছবি চলত, বিদ্যুৎ তো ছিল না, তা ভাবিনি কোনওদিন। ডায়নামো কথাটাই জেনেছিলাম অনেক পরে।

সেই মিলনে সিনেমা দেখে, সতীশ ঠাকুরের হোটেলে ভুবনবিখ্যাত চিতল মাছের পেটির ঝোল খেয়ে রাতে সে হোটেলেই থেকেছিলাম। তারপর দিন সোজা বাড়ি। এই ঘটনাটার মাথামুন্ডু খুঁজে পাইনি কখনও। তখন যা পারিবারিক অবস্থা তাতে এট

বেশ বিলাসিতাই মনে হয়। নিশ্চয়ই অন্য কারণ ছিল কোথাও। জানা হয়নি। এরই মধ্যে কোনও একবার মাদারিপুরের পথে হঠাৎ কুড়িয়ে পাই একটা সিগারেটের প্যাকেট -- রূপসা। আমি কোনওদিন জানব না কেন ওই প্যাকেটের নাম, বাংলায় লেখা, আজও আমায় বিমনা করে দেয়। বাবা খেতো স্টার সিগারেট, তাতে নীল রঙের মধ্যে তারা জ্বলতো, কিন্তু রূপসার মতো কিছু আমি আজ পর্যন্ত ছুঁইনি, না সিগারেটের প্যাকেট না অন্য কিছু।

লঞ্চঘাট থেকে সোজা উঁচু রাস্তা চলে গিয়েছিল মধ্যপাড়ার দিকে। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে একটা গুলতির মতো দুদিকে দু-মুখ বাঁকানো ছিল তার। ডান দিকে ধরে গেলে আঙ্গারিয়া বাজার। পেরিয়ে গেলে, অনেকটা হাঁটলে, কোন ধারে জানি না, আঙ্গারিয়া মডেল প্রাইমারি স্কুল। গুলতির ঠিক মুখে ছিল মনু ঘোষের মিষ্টির দোকান, সেখানে দু-আনার দই খেয়ে উল্লসিত হয়েছি কতবার। বাঁ-দিকের যে রাস্তা তার মুখেই ছিল একটা দালান, কলকাতার ভাষায় পাকা বাড়ি, যেখানে জানলার গরাদে মুখ রেখে নির্বাক চোখে তাকিয়ে থাকত এক যুবক। ওই বাড়ি পেরোবার সময় চোখ বন্ধ করে যেতাম। কে যেন শিখিয়েছিল ও পাগল। মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠত ছেলেটা। মাঝে-মধ্যে সে চিৎকার করত গলা ফাটিয়ে। কেউ আমায় তখনই প্রথম শিখিয়েছিল যে পাগলকে ভয় পেতে হয়, তা সে বন্দি হলেও। সোজা রাস্তা সম্বন্ধে আমার কিছু বলার নেই। আমি সে রাস্তা ধরে কখনও মধ্যপাড়া বা অন্য কোথাও গিয়েছিলাম নিশ্চয়ই। যেমন নথু ঠাকুরের বাড়ি ধাউনকায়। উনি আমাদের বাড়ির পুজো-আচ্চার কাজ করতেন। কেমন একটা জংলা মতো জায়গায় ছিল ওঁদের বাড়ি, পুরোনো ভাঙাচোরা দালান। অবস্থা খুব খারাপ চলছিল। এখন মনে হয় দূরদর্শী হিন্দুরা দেশ ছাড়ার জন্যই ওই হাল হয়েছিল এইসব পূজারিদের। যথাসম্ভব সম্মান বজায় রেখে চলতেন দারিদ্র আড়াল করে। লোকে উপহাস করত। সংখ্যালঘু হলে সব সময়ই কি এইভাবে এক-একটি পুরোনো শ্রেণী লোপ পেয়ে যায় ? কী করে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম ? তারা তো অন্য কিছু শেখেনি।

ওই বাড়িতে -- ঠিক বাড়ির বাইরেই -- একটা গভীর গর্ত ছিল যা সুড়ঙ্গের মতো চলে গিয়েছিল ঝোপঝাড়ে অদৃশ্য হয়ে। অদ্ভুত রহস্যজনক সেই সুড়ঙ্গ। গল্প ছিল, সুড়ঙ্গটা নেমে গেছে মাটির গভীরে। সেখানে পৌঁছনো শক্ত। দশ-বারো ফুট লম্বা কালকেউটে, গোখরো এবং চন্দ্রবোড়ার ঘর-গেরস্থালী পেরিয়ে যেতে হয়। কিন্তু নীচে পৌঁছতে পারলে, যা তখনও কেউ করে উঠতে পারেনি এবং যা নিয়ে আলাদা গল্প আছে, দেখা যাবে এক পুকুর। সেখানে আছে সোনার নাও আর পবনের বৈঠা। সেইসব যদি তুমি একবার পেয়ে যাও, তাইলে ব্যাস, আর কী ?

এরকম আশ্বাসের পরে কে আর জিজ্ঞেস করবে, আর কি ? মানে সোনা না হয় বেচে পয়সা পাওয়া যাবে, কিন্তু পবনের বৈঠা ? কী করা হবে ওটা নিয়ে ? নাকি ওই মিথ-এর মধ্যে ছিল নদীমাতৃক দেশের স্বপ্ন -- একখানা শক্ত নৌকো যা কিনা আমার

নিজের, কোনও হালার পো হালার হক নাই ওই নৌকায়, আর একখানা বৈঠা -- এমন এক আশ্চর্য বৈঠা যা আমায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে এক মহত্তর অলস গ্রামীন জীবনে। যখন জীবনে ব্যস্ততা বলে কিছু নেই, যখন হাঁসের নীড়ের থেকে খড়, পাখির নীড়ের থেকে খড় ইত্যাদি লইয়া আমি পইড়া থাকুম, মধুমতী যায় বইয়া যায় নির্জনতা লইয়া। কাম কি করণের ?

গা-ছমছমে চোখে তাকিয়ে ছিলাম সেই সুড়ঙ্গের দিকে। আজ ভাবলে কেমন লাগে যে ওই স্বপ্নের ওপরই নথু ঠাকুরদের বিষন্ন বাস্তবতা। জরাজীর্ণ বাড়ি, অসুস্থ কালী ঠাকুরের শয্যাশায়ী কাশির শব্দ, আর রোজ নতুন যজমানদের ছেড়ে যাওয়া শূন্য গৃহস্থালীর ছবি। নথু ঠাকুর নিশ্চয়ই কখনও আনমনা হয়ে যেতেন সোনার নৌকার কথা ভাবতে গিয়ে। ক্রমবিলুপ্ত এক সংখ্যালঘু জীবিকার শেষ দুপুরের ছবি মনে পড়ে। নথু ঠাকুর বারান্দায় বসে, ভেতর থেকে ভেসে আসছে বাবার কাশির শব্দ। তিনি ভাবছেন সোনার নাও আর পবনের বৈঠার কথা।

তাঁর চেহারা আমার ঝাপসা মনে পড়ে। মাঝারি উচ্চতার অল্প ভুঁড়ি সহ একটা রোগা লোক। পুরোহিতের মতো করে পরা ধুতি, খালি গা। নিশ্চয়ই উনি তখন যুবক ছিলেন। আমাদের বাড়ির বড়রা ওঁকে তুই সম্বোধন করত। একেবারে ছোটবেলা থেকে বাবার হাত ধরে এ বাড়িতে এসেছেন নথু। ওরকম নরম চেহারার জন্যেই বোধহয় আমার ডাকাবুকো ছোড়দার মনে কোনও একটা উপহাস ছিল। কেমন যেন শয়তানি হাসি হেসে একটু দূর থেকে নথু ঠাকুরকে দেখিয়ে ছোড়দা চাপা গলায় বলত, নথ-থু ঠাকুর। আমার হাসি পেত। কিছু একটা ছিল দাদার সুরে। তাঁর বাবা কালী ঠাকুরকে অবশ্য ব্যক্তিত্বের চাপে পড়তে হয়নি কখনও। তিনি যে সময় যজমানী করতেন, তখন চারপাশের দাপুটে মানুষেরা ছিলেন তাঁর ক্লায়েন্ট। কিন্তু এখন ভেতরের ঘরে শুয়ে কাশতে কাশতে নিশ্চয়ই বুঝতে পারেননি কী হয়ে চলেছে পূর্ব পাকিস্তানে। এক অর্থে বেঁচে গিয়েছিলেন। আমি শুনেছি এই শ্রেণীকে শারীরিক অবমাননাও সহ্য করতে হয়েছে। এই পরিবারের যে কী হয় জানি না। আমাদেরই মতো পালিয়ে এসেছিলেন কি ? নাকি মারা গিয়েছিলেন খানসেনাদের হাতে ? আঞ্চলিক কোনও চর মুহূর্তে দেখিয়ে দেয় তাঁকে হিন্দু বলে, সে সময় তাঁর কাছে গোটা দৃশ্যটাই কি অবাস্তব লেগেছিল ? গুলি করে মারাটাই স্টাইল ছিল শুনেছি। রুদ্রকরের এক নিরীহ শখের সেতার-বাদক উপেন বিশ্বাসকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল জঙ্গলে। সব সময় যে মিলিটারি মারত এমন নয়, রাজাকরেরাও মারত। হয়তো মিলিটারির কেউ সস্নেহে বন্দুক বাড়িয়ে দিল বাচ্চা খেলবে বলে। বাচ্চা খেলল, গুলি করল নথু ঠাকুরকে। এমন হয়েছিল কি ? কালী ঠাকুরকে যখন মারল, তখন কি উনি কেশেছিলেন ? তারপর আর্মি চলে গেলে বাড়ি লুঠ, শেষে আগুন ধরিয়ে দেওয়া, দু-রাত কাটতে না কাটতেই জমি এবং বাড়ি অধিকার। সাত দিন বাদে হেঁটে গেলেই মনে হবে সংখ্যাগুরুরা কী দ্রুত, কী পরিশ্রমী। এরই মধ্যে নতুন বসতি গড়ে উঠেছে।

সারারাত গাজির কলাবাগানে কাটিয়েছিলাম আমরা। শুনছিলাম রাইফেলের, মর্টারের শব্দ। প্রথমবার মেশিনগানের শব্দ শুনে আমরা মাটিতে উপুড় হয়েছিলাম। কোন দূরে চলছিল মেশিনগান, মধ্যপাড়ার, রুদ্রকরে। আমাদের হাতের তালুর মতো ছোট গ্রামে মিলিটারি ঢোকেনি। আমাদের মিথ্যে বলা হয়েছিল উপুড় হয়ে শুতে, বাড়ি থেকে পালিয়ে আসতে। কোনও চর রাস্তা দেখালেও ওই নিচু ছোট পথে নামত না তারা। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের ভয়ও ছিল ওরকম জল-জঙ্গলে। অর্থাৎ সারারাত যে শব্দ আমরা শুনছিলাম তা অনেক দূরের। যে আগুন দেখেছিলাম তা দূরের এবং বেশ কাছের। মিলিটারির ভয়ে আমরা বেরবো না জেনে আমাদের বাড়ি লুঠ করে শেষে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মিলিটারি ছিল না কোথাও। আমাদের চাচারা ছিল, তাদের লায়েক ছেলেরা ছিল। ওদের সঙ্গে খেলেছি আমরা। মোটামুটি উদার পরিবার ছিল আমাদের। জাতপাতের বাড়াবাড়ি, জাত তুলে গালাগাল করতে শুনিনি কাউকে। আমার বাবার ডান হাত ছিল বজু, তার দাদা আফতাজুদ্দি কাজি আমাদের আশ্রিত ছিল। এরা দুজন নয়, কিন্তু এদেরই মতো কাছের কেউ জড়িত ছিল ওই আগুন লাগানোয়। গুন্ডা-বদমাইশ নয়, ভদ্রলোক তারা। গুন্ডাদের হয়তো ধ্বংসকার্যে লাগানো হয়েছিল, কিন্তু আজ জানি নেতৃত্বে ছিল কোন শ্রেণীর মানুষ। এটা বুঝতে পারি কিছুদিন পরে গইয়াতলায় এক ভদ্র সংখ্যাগুরু বাড়িতে এক দিন আশ্রয় নিতে গিয়ে। ওই বাড়ির একটি ছেলে আমার ছোড়দার সমবয়েসি। তার পড়ার বইয়ের মধ্যে আমার আর ছোড়দার বইও ছিল। আমাদের নাম লেখা। আমার ওই ছোট মাথাও ঝাপসা তখন। যা দেখছি তা মানলে -- মানে -- ছোড়দা ওকে জিজ্ঞেস করল, এগুলো কি তোমার বই ? ছেলেটা এক আশ্চর্য নম্র হাসি হেসেছিল শুধু। হ্যাঁ-না কিছু বলেনি।

তখন না বুঝলেও এটা সত্যি যে আমি বড় হয়েছি দিন-আনা-দিন-খাওয়া অবস্থায়। পরিবারের পড়ন্ত সময়ে। যদিও আমি নিজে কোনও রকমেরই অভাব অনুভব করিনি কখনও। তুলনামূলক কিছু ছিল না তো। পেট ভরে খেয়েছি ডাল-ভাত-তরকারি-বিভিন্ন মাছ। কখনও একটা-দুটো সন্দেশ রসগোল্লা। এমন নয় যে আমাদের প্রচুর সোনাদানা ছিল যা লুঠ করায় আমরা পথে বসলাম। অজস্র কাঁসা-পেতল-রুপোর জিনিস লুঠ করা হয়েছিল, সোনা-দানা ছিল না বলেই জানি। লুকোনো টাকার প্রশ্নই ছিল না। আসলে যেটা লুণ্ঠিত হল তা ভিটেমাটি যার চেয়ে বড় কিচ্ছু নেই। আসলে লুঠ করা হল অবস্থান, সম্মান এবং ভবিষ্যত। চূড়ান্ত সঙ্কেত পাঠানো হল -- এবার যা। না হলে ওই ভিটের মতো জ্বলবি। পরদিন সকালে নৌকো করে আমাদের যাত্রা শুরু হল সিরাজ সর্দারের বাড়ির উদ্দেশে। তার আগে ভিটেদর্শন হয়েছিল। সব ফাঁকা-পোড়া শূন্য, নতুন ঘর, মাঝের ঘর, রান্নাঘর সব ফাঁকা। কিছু উঁচু-নিচু মাটির ঢিবি দেখা যাচ্ছিল। ওখানে পুড়ে গিয়েছিল আমাদের গোটা জীবন। পুড়েছিল বিশ্বাস। কদিন বাদেই বোঝা গেল, খবর এল, বাড়িতে লোক আসছে। সেই সকালে আধোঘুমে চলে আসার সময় থেকেই কী করে যেন আমার মনে হচ্ছিল, আবার সব ঠিক হয়ে

যাবে। বাবার ঘরের সামনে তখনও জ্বলছিল এক টুকরো অঙ্গার। সে কিন্তু অন্য কথা বলেছিল। আমি বুঝিনি। দান্দা যে কেন কাঁদছে, বাবা ছাড়া সবাই যে কেন কাঁদছে বুঝিনি। আমি কাঁদিনি। ভেবেছিলাম সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবার মধ্যে বাইরের উচ্ছ্বাস ছিল না একদম, যদিও জানি সম্ভবত আবেগপ্রবণ মানুষ ছিল বাবা। আশৈশব বাবাকে না পেয়ে বড় হওয়া আমার। কিছু মুহূর্ত দেখে আর পরে বড়দের কাছে শোনা গল্পেই চিনেছিলাম বাবাকে। বাবা চুপ করে দেখেছিল সব।

পর্ব ৪

এরপর আমরা বাবার বন্ধু শিরাজ সর্দারের কাশীপুরের বাড়িতে আশ্রয় পাই। শিরাজের বাবা আছাদুল্লা ছিলেন দান্দার বন্ধু। সেখানে আমরা একটানা একুশ দিন ছিলাম। সেই যাত্রা শুরু। চল্লিশ পেরোতে বুঝতে পারি, বাস্তু হারানোর যন্ত্রণা নাড়া দেয় আবার। কোনও এক দৃঢ়প্রোথিত মাটির কাছে গাছ আর জলাভূমির কাছে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সেরকম কোনও জায়গা নেই আমার। শান্তিনেকতনে দু-কাঠা জমি কিনে লাভ নেই। ও জমি আমার বাস্তু নয়।

এর অনেক দিন পর আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে দু-একজন হিঁদুয়ানা-উদ্যোগী বন্ধু আমায় উস্কেছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গালাগাল করতে। আমি কখনও তা করিনি। আমার আজও মনে হয় বিষয়টা ততটা হিন্দু-মুসলমান নিয়ে নয় যতটা সংখ্যালঘু/গুরু নিয়ে। উন্মত্ত মানুষের কি জাত হয় ? শিরাজ সর্দারের মতো স্নেহময় মানুষই বা দেখলাম কটা ? ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুর পর দেশে যে শিখ-নিধন হয়, তার জন্য দায়ী তো হিন্দুরাই। অবশ্য আমরা কলকাতার লোক। সব কিছুরই আঁচ গায়ে কম লাগে, তাই এত বোধ -- এত চেতনাবিলাস। এক একটা দাঙ্গা, এক একটা নকশাল আন্দোলন বড় বেদনার মতো বাজে প্রাণ। তার রোমান্স ছাড়া আর কিছুই থাকে না কোথাও। মুছে যায়।

গোবিন্দ নামের সেই দালালের সঙ্গে যখন রফা হয়, সেদিন দান্দা জানতে চেয়েছিল, পথে খাব কী ? এক অদ্ভুত সুরে গোবিন্দ বলেছিল, ক্যান ? চিড়া খাইবেন, গুড় দিয়া। তার সেই আনুনাসিক ধ্বনি, ভাঙা কালো দাঁতের সারি, সেই শেয়ালমুখো হাসি। ভাবতে অবাক লাগে যে ওই সময়েও রসবোধ যায়নি আমাদের। পালানোর সেই শেষ ধাপেও গোবিন্দর একটু পেছনে হাঁটতে হাঁটতে তার গলা অনুকরণ করে আমরা বলতাম, ক্যান ? চিড়া খাইবেন, গুড় দিয়া ? যাকে বলা হত সে হাসত। মাথায় উকুন, মুখে কালচে ছোপ, পায়ে পাঁচড়া। পারিবারিক এই দলের সদস্য ছিল আটজন সত্তর পেরনো দান্দা, বাবা, মা, বড়দি-কোলে আমার সদ্যোজাত ছোট ভাগনে, হাতে

বড়টি, যার বয়েস দুই, আমি আট, ছোড়দা চোদ্দ। ছোড়দি আসেনি। ঠিক কোনও মুহূর্ত থেকে অদৃশ্য হয়েছিল জানি না। গিয়েছিল কোথায় তা বাকি সবাই জানত, আমি ছাড়া। ছোড়দির সঙ্গে বিবাহিত, কয়েকটা বাচ্চার বাবা এবং মুসলমান আফতাজুদ্দির একটা তুখোর শারীরিক যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। আফতাজুদ্দিকে একবার ঠ্যাঙারে দিয়ে পেটানো হয়েছিল বাবার নির্দেশে। তাতে কিছু লাভ হয়নি। কারণ, ছোড়দি ব্যাপারটায় সমানভাবে জড়িত ছিল। কবে যেন ইঁদুর মারার বিষ খেয়ে বা না খেয়ে, আত্মহত্যার সিন করেছিল। সম্ভবত আফতাজুদ্দিকে বিয়ে করায় বাড়ির অনুমোদন চেয়েছিল সে। কিংবা গর্ভ ধারণ করেছিল। মনে হয় দুটোই একসঙ্গে। ঝাপসা মনে পড়ছে কবে যেন একবার গ্রামে ফিরেছিলাম, মার সঙ্গে। মা ছোড়দিকে বারবার বলল চলে আসতে, ও কিছুতেই এল না। শেষে পালিয়ে গেল। এটাই আমি বুঝতে পারি না। যতক্ষণ ছিলাম ও একবারও এল না। ভাবতে ইচ্ছে করছিল ও দূর থেকে লুকিয়ে দেখছে আমাদের নৌকো ছাড়া, চলে যাওয়া, শেষবারের মতো, তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ছে। ওকে আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। শুনেছি ওদের নিয়ম অনুযায়ী মুসলিম নাম নিয়ে সে বিয়ে করেছে আফতাজুদ্দিকে। সে-নাম আমার মনে নেই। আফতাজুদ্দির একটা চিঠি এসেছিল, পোস্টকার্ড, আমার নামে। সে খুব একটা জামাইবাবু ধরনের চিঠি। নৈহাটি না কোথায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে সে আসবে। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়। আমি ঘৃণাভরে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে চিঠি পাঠাই। এ-বিষয়ে আমি পারিবারিক কড়া চিঠি লেখার রেওয়াজ মেনে চলি। পরে মনে হয়েছিল, কত বড় মাথামোটা আমি, এভাবে আফতাজুদ্দির গল্পটা হারালাম। হারালাম আমাদের পরিবারের এক অন্য বয়ানের গল্পও। কিন্তু তখন আমার বয়েস সম্ভবত উনিশ। এক উদভ্রান্ত বাঙাল মরালিস্টের উনিশ বছর আর কেমনই বা হবে ?

এই আটজন যখন বাদাবন ভেঙে আরও অন্য মানুষদের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে, তখনও রেডিও বাজত ঝোপেঝাড়ে, লুকোনো জায়গা থেকে শোনা যেত মুজিবর রহমানের গলা। সেই কণ্ঠস্বর জাগিয়ে তুলতও দিন-রাত লড়াই করে চলা তরুণ ছেলেদের, যাদের আমরা মুক্তিযোদ্ধা বলে জানতাম -- অরা আমাগো দাবায়া রাখতে পারব না। আর শোনা যেত, সাড়ে সাত কোটি মানুষের আদেশ পেলাম -- কোরাসের মুজিবর মুজিবর সাড়ে সাত কোটি প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম। কয়েকটা গান বোধহয় অংশুমান চৌধুরীর গাওয়া। আর একটা গানও মনে আছে - শোনও একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের বাণী। আমাদেরই মুখে লেগে থাকত এই গান, আর মুক্তিযোদ্ধাদের যে কীভাবে প্ররণা যোগাত তা বলে বোঝানো যাবে না। ঝোপঝাড় থেকে কখনও হঠাৎ বেরিয়ে আসত এইসব তরুণেরা। এখন ভাবি, তখন তারা কত ছোট ছিল -- উনিশ-কুড়ি বছর বয়সের কিছু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যুবক লড়াই করে চলছিল তাদের স্বাধীনতার জন্য। বাংলাদেশ নাম তখনই চালু হয়ে গেছে মুখে মুখে। আমরা পালাচ্ছি আর ওরা লড়াই করছে। এদের ট্রেনিং হত ভারতে, এমনটা শুনেছি।

এদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে পড়ে কাঞ্চনদা। এক সুদর্শন মুসলমান যুবক। ঝকঝকে চোখ তার। পালানোর সময় কোথাও দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে। আমার ভারী ইচ্ছে করত ওরকম কেউ বুলাকে বিয়ে করবে কোনও এক দিন। হঠাৎ শুনলাম সে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। অনেকদিন বাদে কে যেন বলেছিল কাঞ্চনদা মারা গিয়েছে। আমার খুব কষ্ট হয়েছিল। তাকে নিশ্চয়ই ধরিয়ে দিয়েছিল খুব কাছের কেউ কোনও চাচা বা খালা। তাকে হত্যা করেছিল কোনও রাজাকার বা আর্মির কেউ। একখানা আস্ত মুক্তিযোদ্ধা পেয়ে মিলিটারি নিশ্চয়ই খুন করার আগে তার আরও অবমাননা করেছিল। কাঞ্চনদার ছিন্নভিন্ন শরীরের ওপর দিয়ে যে রাষ্ট্রের পতন, সে আজ ইসলামিক রিপাবলিক। কাঞ্চনদাদের যাদের বিরুদ্ধে লড়াই ছিল, সেই সব বিশ্বাসঘাতক আজও আছে ওই দেশে। এত বুদ্ধিজীবী, এত সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ তাদের কোনও ক্ষতি করতে পারেনি কোনওদিন। রাজনীতি বড় জটিল, পুত্র তুমি তার অর্থ বুঝবে না। ওই সময়ের হত্যাকারীদের সঙ্গে বাংলাদেশ আজ বাণিজ্য করে, বন্ধুত্ব করে, ক্রিকেট খেলে। আর ওই সময়ের বন্ধুদের বিরুদ্ধে টেররিস্টদের ট্রেনিং দেয় বলে অভিযোগ ভারতের। মাইরি সেলুকাস।

এইসব বিস্ময় আর ক্রোধের মধ্যে কখন আবার চলে আসে ভিটের স্মৃতি। মেজদাদু গুনগুন গান গাইছে পুকুরপাড়ে। তার ছেলে তখন যুবক। মামাবাড়িতে বড় হচ্ছে। যৌবনের মেজদাদুকে দেখে শুনেছি মাথা ঘুরে গিয়েছিল দিদিমার। অল্প দিনের হলেও ভারী সুন্দর সব মুহূর্ত নাকি গড়ে উঠেছিল দুজনের মধ্যে। ভাল কালোয়াতি গান গাইত মেজদাদু। নতুন বৌ নিশ্চয় সেসব শুনেও মুগ্ধ হয়েছিল। এরপর ট্র্যাজেডি। সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে দিদিমার মৃত্যু এবং মেজদাদুর গৃহত্যাগ। কাশী, গয়া বা ও জাতীয় সব জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর কিছু দিন। কালোয়াতি গানে তালিম নেওয়া। শেষে ফিরে আসা গ্রামে। প্রায় অপুর সংসারের গল্প। বৃদ্ধ অপু এখন পুকুড়পাড়ে অনাবশ্যক মাটি খুঁচিয়ে চলেছে। শরীর খুব ভাল নেই তার। ডায়াবেটিস ধরেছে যার কোনও চিকিৎসা হয় না। খেতে বড় ভাল লাগে যে। তার ছেলে এখন যুবক। মেজদাদুর ছেলের ছেলে -- ভাস্কর -- আমার সমবয়সি ছিল। ছিল বলতে হচ্ছে কারণ সে আজ বেঁচে নেই। বেশ কয়েক বছর আগে তাকে তুলে নিয়ে যায় কয়েকজন। পরের দিন তার মৃতদেহ ভেসে ওঠে তাদের বাড়ি বেহালা থেকে অনেকটা দূরে, যাদবপুর থানার কাছে এক পুকুরে। তাকে খুন করা হয়েছিল। আদর্শবাদী এবং সংস্কারক ভাস্করের সঙ্গে ছোটবেলার পরে আমার দেখা হয়নি কখনও। আমার একেবারে বিপরীত চরিত্রের মানুষ ছিল সে। বিশাল চেহারা ছিল শুনেছি, মেজদাদু বা কাকুর মতো। সব সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবাদ করত। এক বিতর্কিত নেতার ইশারায় শুনেছি এই অযথা মৃত্যু ঘটে। কেউ কিছু করতে পারেনি।

কিন্তু সেসব অনেক পরের কথা। এখন তো ১৯৬৯। এখন তো মেজদাদু গুনগুন গান গাইছে 'ইয়াদ পিয়াকি আয়ে'। এখনও এই নদীমাতৃক দেশের জলে-জঙ্গলে খেলা

করছে নদীর স্বপ্ন, জোলোজমির মিথ। এখনও মাঘ মাসের সকালে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে পরস্পরের গায়ে জল ছেটানো -- 'মাঘের শীত বাঘের গায়/আমার শীত তর গায়।' এখনও কাঁপা সিনেমার পর্দায় রাজ্জাক গান গেয়ে চলেছেন, নীল আকাশের নীচে আমি রাস্তা চলেছি একা। এই সব মোহময় মুহূর্ত ছড়ানো এখন উঠোন জুড়ে। মেজদাদুর কাজ শেষ হচ্ছে না। এখন নতুন গাছের চারা লাগাচ্ছে -- 'বালি উমরিয়া, সুনরি সাঁবরিয়া'।

পর্ব ৫

অত কাছ থেকে গোখরো বা কেউটে সাপ আগে দেখিনি। অত ভয়ের সম্মোহনও অনুভব করিনি আগে। বিষ দাঁত ঝলসে উঠছে মাঝে-মধ্যে। উদ্ধত ফনা চারদিকের প্রতিপক্ষকে খুঁজছে। একবার পেলেই ছোবল। বাঁচার কোনও সম্ভাবনা থাকবে না। মুশকিল একটাই, সাপটা এসব কিছুই করতে পারবে না। তার হাড় ভেঙে দেওয়া হয়েছে। হত্যাকারীরা সংগঠিত, তাদের হাতে লাঠি, সাপটার নড়ার ক্ষমতা নেই। হত্যাকারীরা সাপের তর্জন দেখছে খুব আমোদের মুডে। আবার লাঠির বাড়ি। রক্তপাত। সাপের ফনা নেতিয়ে যায়। সামান্য নড়ছে। এবার দুজনে লাঠি দিয়ে মারছে। সাপ আর নড়ছে না। খেলা শেষ। রক্তাক্ত দড়ির মতো তাকে গলায় জড়িয়ে চলে যায় ঘাতকেরা। আমার খুব খারাপ লেগেছিল সাপটার ওই অহংকার ওভাবে মরে যেতে দেখে।

বাবার ঘরের লাগোয়া ছোট ঘরে ছোড়দি শুতো। মাঝরাতে উঠে সে শুনতে পায় সাপের তীব্র ফোঁস ফোঁস। শব্দটা আসছিল তার ঘরের পাশের একটা বারান্দা ০মতো জায়গা থেকে। ওটা ছিল আঁতুড়ঘর। ওখানে একটা ফাঁকা মাটির হাঁড়ি ছিল। ছোড়দি ভয়ে আবার ঘরের দোর দেয়। পরদিন সকালে ওখান থেকেই বেরোয় সাপটা, তাকে মেরে বের করে দুজন নামকরা সাপ মারিয়ে। কেন যে একা একটা সাপ ওরকম ফোঁস ফোঁস করছিল, তা জানা যায় না। হয়তো অন্ধকারে হাঁড়ি থেকে বেরোতে অসুবিধা হওয়ায় তার প্রতিবাদ জানাচ্ছিল সে। পরদিন মার খেয়ে পালাতে গিয়ে সে উঠোনে গিয়ে পড়ে। প্রতিপক্ষ কাবু করে তাকে। তারপর খেলা করে।

এই খেলা ব্যাপারটা এত অদ্ভুত যে তলিয়ে ভাবলে চমকে যেতে হয়। মাছ ধরতে গিয়েও এরকম খেলা চলত। ছোট ছিপে মুশকিল হত। কিন্তু হুইল লাগানো ছিপে কোনও মাঝারি গোছের মাছ ধরা পড়লে, শুধু সুতো ছেড়ে যাওয়া হত। প্রথম দিকে মাছের বেদম ফুর্তি। ভাবছে স্বাধীনতা পেয়ে গেছে, শুধু মুখে কী যেন একটা লেগে আছে। ও ঠিক হয়ে যাবে। এদিক-ওদিক সাঁতরেও স্বাধীনতা যাকে বলে, সেই

বড়শিহীন ভেসে বেরোনোর সুবিধা পাচ্ছে না মাছটা। বিশ্বাসই করতে পারছে না যে সে আসলে পরাধীন, তাকে নিয়ে খেলা করছে রসিক মাছ-শিকারী। এক সময় ক্লান্ত হয়ে যাবে মাছ। তারপর শুধু তুলে নেওয়ার অপেক্ষা। সব কটা খেলাই একরকম।

এই নিষ্ঠুরতা দেখার পরেও ভিটে জ্বলে গেলে বুক ফেটে যায়। যে জ্বালিয়েছে বাড়িঘর, সেও খেলছিল, যা লুঠ করেছে সবই কি কাজে লেগেছে তার ? না। ওগুলোও ছিল খেলার ছোটখাটো উপকরণ। খেলতে গেলে এমন হয়। বনগাঁ থাকার সময় অবশ্য এভাবে ভাবতে পারিনি।

বনগাঁ থাকাকালীন কিছু ঝাপসা মুহূর্ত মনে আছে। অনেকদিন ছিলাম সেখানে। পাকা বাড়ি বলে কথা। সর্বদাই ছিল ক্যাবলামো করে ফেলার ভয়। কিন্তু কেউ বকত না কখনও। এক আশ্চর্য ভালবাসা পেলাম সেখানে যা নাগরিক। আমাদের গ্রামীণ ভালবাসার প্রকাশে কিছু কিছু শারীরিক ধাক্কাধাক্কির ব্যাপার ছিল, কিছু অনাবশ্যক গর্জন ছিল। এখানে এসে যে ভালবাসা পাই, এমন নিয়ন্ত্রিত স্নেহের ধরন, যা আমি আজও ভুলতে পারি না। কাকু-কাকিমা আর তোতন, আমার দিদি, বছর তিনেকের বড়, আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমি প্রতিদিনই করে ফেলি কিছু ক্যাবলামো কিন্তু কেউ বকে না। ক্রমে পাঁচড়ার দাগ মিলিয়ে যায়, মুখ-চোখ মসৃণ হতে থাকে কিন্তু বাবার খবর পাই না কোথাও। জাগা-ঘুমোনোর মধ্যে এক বিস্মৃতির দোলাচল। ঘুম থেকে ওঠার সময় বুঝতে পারি না রুটি সেঁকার গন্ধ নেই কেন ? শব্দগুলো কোথায় গেল ? মা আর সুধীরদার মা আজ নিশ্চুপ, দান্দার গলা-খাঁকাড়ির শব্দ কই ? কিন্তু ঘুম ভাঙে অন্য কোথাও। মেলাতে সময় লাগে। স্থির হয়ে শুয়ে থাকি দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে। বাবা আইল না ক্যান ? অহনও আইল না ! বাড়ি যামু। আর বেলা বাড়তে থাকে। ঝকঝকে পাঁউরুটির স্বাদ, টেবিলে বসে খাওয়া, পোচ বলে এক অদ্ভুত খাবার। দুটোও খাওয়া যায় কিংবা কড়াইশুঁটির কচুরি, শান্ত-স্নেহসুন্দর দিন ক্রমে বাবাকে ভোলাতে থাকে। এভাবে বাবা হয়ে ওঠে সোনার নাও আর পবনের বৈঠার অধিকারী সেই মাঝি, যে ভাল আছে। আইব, বাবা আইব এই শব্দ হ্রস্বতর হতে থাকে। মেজদাদু তখন বহুদিন হল নেই। আমাদের সঙ্গে আসতে হয়নি তাকে। ঢের আগেই চলে গেছিল মেজদাদু। শেষ দিকে খুব কষ্ট পাচ্ছিল। বেডসোর হয়ে গেছিল, ডায়াবেটিস শেষ করে দিয়েছিল তাকে। ছোড়দা আর ছোড়দি খুব শুশ্রূষা করত মেজদাদুর। গলা থেকে শ্লেশ্মা বের করে দিত আঙুলে ন্যাকড়া পেঁচিয়ে। শরীরের নোংরা মুছে দিত সব। তারপর একদিন ভোরবেলা ডেকে দিল বড়দি, কুট্টি উইঠা আয়, মেজদাদু মইরা গেছে।

সেই প্রথম মৃত্যুর স্মৃতি। একটা মানুষের ক্রমে নেই হয়ে যাওয়া যে কিনা তার সব কিছু রেখে গেছে এই বাড়ির আমবাগান, পুকুরপাড়, আর আশপাশের মেঠো রাস্তায়। হঠাৎ দুপুরে মনে হত মেজদাদু আলত গলায় ডাকছে, কুট্টি মহারাজ। খুব ভয় করত

তখন। এক দৌড়ে বাড়ির ভেতর, মার কাছে। দান্দা আর মেজদাদু একই ঘরে থাকত, নতুন ঘর ছিল তার নাম। মেজদাদুর মৃত্যুর পর দান্দা সেখানে একা থাকতে ভয় পেত। ওই ঘর ভেঙে দেওয়া হয়। দান্দা চলে আসে আমাদের ঘরে যেখানে মা, আমি আর ছোড়দা একসঙ্গে শুতাম। মেজদাদুকে দাহ করা হয় নদীর ধারে আমাদের পারিবারিক শ্মশানে। বহুদিন মেজদাদু থেকে গেছিল আমাদের সঙ্গে। বাড়ি পুড়ে না গেলে হয়তো আরও থাকত।

বনগাঁ থাকার সময়ই আসে বড়দা। কলকাতায় এসে বেশ কিছুদিন স্কুল মাস্টারি করে তখন সে ব্যাঙ্কে চাকরি করছে আর উদভ্রান্তের মতো টাকা জমাচ্ছে আমাদের জন্য। নিয়মিত আমাদের থাকা-খাওয়ার টাকা জুগিয়ে গেছে। নিজেকে অবহেলা করেছে দিনরাত। কীভাবে যে বড়দা অত বড় একটা সংসার চালাত, নিজেকে কতটা কষ্ট দিয়ে, তা আমি আজও জানি না। তখন সে জয়পুরে পোস্টেড। দান্দার প্রতি তার শ্রদ্ধা, ভালবাসার তুলনা হয় না। তাকে পড়ানোর, ঢাকার খরচ চালানোর সমস্ত টাকা দিয়েছিল দান্দা। যদিও মেধাবী ছাত্র ছিল বলে দাদা কিছু বৃত্তি পেত, কিন্তু মূল পেট্রন ছিল দান্দা। সেটা এবং দান্দার ব্যক্তিত্ব কোনওদিন ভোলেনি দাদা। একেবারেই থেমে যাওয়া, প্রায় মূক পেট্রিয়ার্কের সামনে শ্রদ্ধায় তার মুখ নত হয়ে থাকত। এই ব্যাপারটা আমরা কোনওদিন বুঝিনি। দান্দা আমাদের অনেক কাছের মানুষ ছিল। আমরা তুমি বলে ডাকতাম। বড়দা আপনি বলত। মা ছাড়া আর সবাইকেই আপনি বলত সে। পরে বুঝেছি, দান্দার ব্যক্তিত্ব এবং প্রভাবের মাঝদুপুরে জন্মেছিল সে। বড় হয়েছিল তারই মধ্যে। তাই দান্দার ট্র্যাজিক পতনের মানে হয়তো বুঝত বড়দাই। এরপর কোনও কারণে বনগাঁ ছাড়তে হয় আমাদের। এর মধ্যেই চলে আসে প্রবাদের কুট্টিদাদু, মা-বাবা সবার প্রিয় মনুকা। চোখ ঝলসে দেওয়ার মতো রূপবান মানুষ। এর কথা আমরা এত শুনেছি। মেজদাদুর থেকেও যে ভাল গল্প বলতে পারে, যার গোটা জীবনই একটা লম্বা অ্যাডভেঞ্চার, সেই কুট্টিদাদু একেবারে মুখোমুখি। অনেক উজ্জ্বল এক তীক্ষ্ম মানুষ, দেখলে গা ছমছম করে। আমি মুগ্ধ। ছোড়দাও। দরজা ধরে আমি ন্যাংলাপনা করছি। শুধু ডাকার অপেক্ষায়। পরে ডাক এল। কিন্তু অদ্ভুত কোনও কারণে মেজদাদু বরাবরই এক নম্বরে থেকে গেল আমার কাছে। আলাভোলা, অসংসারী মেজদাদুর কাছে হেরে গেল অনেক প্রখর কুট্টিদাদু। শুধু এক স্নিগ্ধ ভালবাসার কারণে। এর কদিন পরেই কুট্টিদাদুর ছোট ছেলে অলোককাকু আমাদের নিয়ে আসে বেলেঘাটায়। দান্দা কখনও যায়নি সে বাড়িতে। মেজছেলের কাছে আরও কিছু দিন থেকে যায় দান্দা।

সেই প্রথম ট্রেনে চড়া। বর্ডারের কাছে যে রেললাইন দেখে আজন্মমুগ্ধ, সেই রেললাইন চোখের সামনে। বনগাঁ স্টেশন। কিন্তু কোনও ঘোর জাগেনি মনে। প্ল্যাটফর্ম জুড়ে রাশি রাশি মানুষ। বাচ্চার চিৎকার। বিপর্যস্ত জীবন ছড়িয়ে বসে থাকা অসংখ্য মানুষ। অথচ মাত্র তিন মাস আগেই এদের ঘরবাড়ি ছিল, সম্ভ্রম ছিল, সংস্কার

ছিল, আব্রু ছিল। এখন সব কিছু হাট করে বসে আছে। কদিন বাদে হারিয়ে যাবে বা জন্ম দেবে এক দীর্ঘকালস্থায়ী ভিখারি শ্রেণীর। ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তার মধ্যে ঢুকে যাবে কোনও শেয়ালডাকা বাদাবন ভেদ করে, গড়ে উঠবে কলোনি, চেষ্টা করবে আর একবার রুখে দাঁড়াতে, পারবে না। হারিয়ে যাবে। তখন এসব না বুঝলেও ট্রেনের মোহ আর মন ছোঁয়নি।

শিয়ালদা স্টেশনে সেই এক দৃশ্য। আরও ব্যাপক। কিন্তু তখন তো এসে গেছে কলকাতা। তখন ফ্লাই-ওভার হয়নি শিয়ালদায়। পুরোটা জুড়ে ছড়িয়ে আছে আমার স্বপ্নের শহর। ওই হুড়োহুড়ির মধ্যেও চোখ শুষে নিচ্ছে সব। এভাবে ট্যাক্সি চড়ে অলোককাকুর কাছে বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে পরিচিত হতে হতে, সমস্ত সত্তা দিয়ে সব গিলতে গিলতে বেলেঘাটা উড়িয়াবাগান মোড়। লতাফৎ হোসেন লেন। কলকাতা ৭১। আমার পুলিশ পিসের বাড়িতে। এ বাড়িতেই উঠেছিল বড়দা দেশ থেকে এসে। এখানে থেকেই একটা স্কুলে পড়াত। ব্যাঙ্কের চাকরিরও শুরু এখানে। এখানেই আবার শুরু আমাদের কলকাতা পর্যায়। দ্বিতীয় রেফিউজি লাইন।

তখনও কলকাতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি নকশালবাড়ির স্মৃতি। দেওয়ালে তখনও লাল অক্ষরে দেখা যেত 'বেইমান-দের 'খতম' করার কথা, 'কমরেড চারু মজুমদার'-এর নামকে তখনও জানানো হচ্ছে 'লাল সেলাম'। তখনও সেই সব ছেলেমেয়েরা গা-ছমছমে একটা বাস্তব হয়ে বেঁচে ছিল। তখনও মনে করা হত পনের বছর বয়সের কিশোরেরাও বিপদসীমার বাইরে নেই। ছোড়দাকে সতর্ক করা হত অনেক সময়। আঘাত যে কোনও দিক থেকে আসবে তা বলা হত না। তখনও নকশাল ছেলেমেয়েরা মিথ হয়ে যায়নি। পরে আমাদের অবশ্যম্ভাবী মিথায়ন চলাকালীন অবশ্য বাঙালি লেখকেরা এই সব মিথ ভাঙিয়ে বেশ কিছু 'মহান' সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন।

তখন নকশাল আন্দোলনের তাৎপর্য বোঝার বয়সই হয়নি আমার। শুধু এই দেওয়ালগুলোর মধ্যে একটা কেমন যেন গন্ধ ছিল। বড়দের টুকরো কথায়, পিসেমশাই-এর সহাস্য গর্জনে বার বার ফিরে আসত ওই সব দেওয়ালের স্মৃতি। ছোটদের ওই শব্দটাই উচ্চারণ করা ঠিক বলে ধরা হত না। কারণটা কিন্তু কেউ জানত না। মা তো একেবারেই চুপ। শুধু চুপ চুপ করত।

বেলেঘাটায় আমি একবার চৌবাচ্চায় নেমে পড়েছিলাম স্নান করতে। ওই ঘটনা দীর্ঘ দিন আনন্দ জুগিয়েছে আত্মীয়দের। আমি আর একটু সিঁটিয়ে গেছি। বারবার নিজেকে বলেছি, বাবা এলে সব বদলে যাবে। বাবা অবশ্যই আসবে সোনার নৌকোয় চড়ে।

বাবার ঘরটা, দেশের ঘরটা, কারণ বাবা আর কোনওদিন কোনও ঘরেই থাকেনি, একই সঙ্গে ভয় এবং রহস্যের সূত্র ছিল। দুপুরবেলায় আমাদের খেলাধুলোর সময়ে

চেঁচানো নিষেধ ছিল। গালাগাল করা ছিল আত্মহত্যার সামিল। বাবা যদি গালাগাল দিতে শোনে কাউকে, তাহলে তার মৃত্যু অবধারিত। বাবার চণ্ডাল ক্রোধ প্রবাদের মতো ছিল। কোনও এক দুপুরে আনন্দে-উত্তেজনায় কাউকে 'শুয়ারের বাচ্চা' বলে জোরে ডেকে ফেলেছিলাম। বাবার ঘর থেকে শোনা গেল, 'কে রে ?' অমনি ছোড়দা আর আমি দৌড়। দৌড়োতে দৌড়োতে কোথায় চলে এলাম। একটা ঢিপি মতন জায়গা, সামনে খাল, আমার তো বটেই, এমনকি আমার হিরো-সমান ছোড়দারও মুখ আমসি। বিকেল পেরোতে ফিরে এসেছিলাম। তাই নিয়ম ছিল। রাগের মুহূর্ত বাবার মনে থাকত না।

বিভিন্ন গালাগাল শিখেছিলাম ওই বয়েসে। তার মধ্যে দুটির অর্থ আমি আজও জানি না ; হাউয়া আর ভোন্দা। এর মধ্যে পাকিস্তানি কোনও প্রভাব ছিল কিনা তাও বলতে পারব না। আর দু-একটি শব্দ দুপার বাংলাতেই চালু ছিল। সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। এ বিষয়ে প্রথম পাঠ পরে, খেলাৎ বাবু লেন এবং মনোহর অ্যাকাডেমি স্কুলে। চোদ্দ বছরের আগেই আমি এ শিল্পে সুনাম অর্জন করে 'বাঙাল' হওয়ার শেষ চিহ্নগুলো মুছে ফেলতে পারি। প্রসঙ্গত বলা যায়, এর দীর্ঘদিন পরে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে বাংলা খিস্তির উৎপত্তি এবং বিস্তার নিয়ে যে মনোজ্ঞ সেমিনার হয়েছিল তাতে আমরা বিভিন্ন বিভাগ থেকে সোল্লাসে হাজির হয়েছিলাম। পবিত্র সরকার, সুবীর রায়চৌধুরি, শঙ্খ ঘোষদের গালাগাল শোনার প্রত্যাশায়। ব্যাপারটা জমেনি। বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকরাই হাজির ছিলেন সেখানে। আমার ধারণা তাঁরাও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন এত অচেনা ছাত্রছাত্রী দেখে।

উত্তর কলকাতায় থাকার সময় আমাকে দ্রুত 'শ' থেকে 'স'-এ রূপান্তরিত করতে হয়েছিল নিজের উচ্চারণ। না হলে প্রবাসে দৈবের বশে ঝামেলায় পড়ে যেতে হত আমাকে। তখন একটি মাত্র খাটে শুয়ে থাকত দান্দা। ট্রান্সিস্টরে ক্রিকেটের কমেন্ট্রি শুনত। মাঝে মাঝে মৃদু হাসি দেখা যেত দান্দার মুখে। বোঝা যেত, দান্দা তখন ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিয়েছে কুড়ি-তিরিশ বছর পেছনে। মাঝে মধ্যে ডেকে উঠত, 'চাঁপা, চাঁপা'। চাঁপা আমার মায়ের ডাক নাম। এসবও পরের গল্প। রেফিউজি লাইন তিন। খেলাৎ বাবু লেন।

পর্ব ৬

একটি দোতলা বাড়ি। দোতলার একটি ঘরে গোবিন্দবাবু আর তাঁর স্ত্রীর সংসার। একতলায় এক ঘর ভাড়াটে, দু-ঘর আশ্রিত আত্মীয় গোবিন্দবাবুর। দুটি পরিবার। এক পুত্রের পরিবার। কন্যার পরিবার অন্য ঘরে। আমাদের সঙ্গে এই সব পরিবারের

যোগ ছিল শুধু এক একটেরে উঠোনের মাধ্যমে, যার মাথায় ছাদ। আমাদের ঘরটিই মাঝারি। অন্য দুটো ঘরের অবস্থা সুমনের গানের মতো, 'ঘেঁষাঘেষি আর ঠেসাঠেসি করে গায়ে গায়ে শুধু কুটকুট'। বাথরুম একটি। সকালে পুরো বাড়ি ফেটে পড়ত সেই বাথরুমকে ঘিরে। প্রায় সতের জন স্ত্রী-পুরুষ-শিশুর সেই তালনৃত্য ভোলা যায় না। উত্তর কলকাতা তখন উপচে পড়ছে রেফিউজি প্লাবনে। তাতে অনেকের সুবিধে হয়েছে। ছোট ছোট অন্ধকার ভাড়াবাড়ির ঘরে, কিশোর-যুবতী মেয়েদের দিকে হাত বাড়াত পাড়ার মুদি দোকানের বৃদ্ধ মালিক। রাতে আসতে ঘরে জামাই-এর মতো। আর কটি ছোট সংসার গড়ে তুলত। সন্ধের পর বেলগাছিয়া মাঠের পাইপগুলোর থেকে উঠে আসত উদ্বাস্তু মেয়েরা। ছড়িয়ে পড়ত এদিক-ওদিক টালা পার্ক, দেশবন্ধু পার্ক। যুবক ছেলেরা সস্তায় নির্ধারিত আনন্দ পেত। বাড়তি হিসেবে প্রেমের কথা বলতে হত দু-একটা। মেয়েগুলো পুরোদস্তুর প্রফেশনাল হয়ে ওঠেনি তখনও।

বেলগাছিয়া মাঠে শীতের সকালবেলা পড়ে থাকতে দেখেছিলাম একটি ভ্রূণ। কালচে নীল রঙ। অদ্ভুত এক কষ্ট হয়েছিল এই ভেবে যে ওর একটা অংশ আমার ফেলে আসা দেশের। ওর মা নিশ্চয়ই আমার ছোড়দার বয়সি হবে। ববিতার মতো করে চুল বেঁধে সে নিশ্চয়ই যেত পুকুরপাড়ে। যশোর, খুলনা বা রংপুরের কোনও রাজজাক বা মুস্তাফা পাশের মাঠে হয়তো তখন জাম্বুরা দিয়ে ফুটবল খেলতে খেলতে ওই মেয়েটির লহমায় আশ্চর্য চাহনি দেখে বিহ্বল হয়ে উল্টোদিকের গোলকিপারকে হালকা করে বাড়িয়ে দিল বল। তার দলের তুমুল প্রতিবাদের মধ্যেও এই দৃশ্যটা স্থায়ী হয়ে রইল।

ওই নীল বাচ্চাটা আমাকে বারো বছর বয়সেই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে মানুষ প্রধানত স্বপ্ন খেতে চায়, অন্যের স্বপ্ন। এর মধ্যে হিন্দু-মুসলমান কোথায় ? এক হিন্দু ছেলেই তো ওই ভ্রূণের উন্মেষ বা তার হত্যার মধ্যে আছে। অতএব, যে ভারতীয়রা এখনও বিশ্বাস করেন যে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত নাগরিক ওই সব টুকরো মানুষদের ভাই রে বলে জড়িয়ে ধরেছিল, জেনে রাখুন তারা সেই ভাইয়ের বোনকে এক পাইপ থেকে পাশের নির্জনতর পাইপে নিয়ে যেত সুবিধে মতো। ক্রমে এক চায়ের দোকানে সেই মেয়েটির ন-দশ বছরের ভাই চাকরি পেত পেটচুক্তিতে। বিভিন্ন সময় তার দিদির সঙ্গে দোকানদারের মিলন নিয়ে খদ্দেররা তাকে ঠাট্টা করত। তবে এরা ভাগ্যবান, এদের প্রতিবেশী পাইপের দিদিরা কোলে বাচ্চা নিয়ে ভিখারি মায়ের ছবিকে পূর্ণতা দিয়েছিল সেই সময়। ইমোশন নিয়ে বজ্জাতি করার ব্যাপারে দুই বাংলাই সমান, মাহাত্ম্য বিষয়ে কথা বলে কী লাভ ?

পালাতে পালাতে আমরা এক সময় উঠি পরেশ পোদ্দারের বাড়িতে। দেশ তখন বর্ষায় থরথর। যুদ্ধ তুঙ্গে। তখনও বাবা ছিল আমাদের সঙ্গে। পরেশবাবুর বাড়িটা যেন ঠিক জলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কাছে-দূরে হোগলার ঝোপ। সর্বদাই চিন্তিত, শীর্ণ

পরেশবাবুর সঙ্গে আমার খুব আলগা কথা হয়েছিল কিছু। ওখান থেকেই এক রাতে বাবা চলে যায় আমাদের গ্রামে। দান্দার নিষেধ শোনে না। আধো-ঘুমে বাবা আর দান্দার কথোপকথন শুনতে শুনতে আমি এক সময় জানতেই পারি না যে বাবা বাড়ির উঠোনে লাগানো নৌকো করে চলে গেল। ওই জলাভূমির সব শব্দই তো ছলাৎ ছল। তার মধ্যে একটা বাড়লে বা কমলে কি ন-বছরের বালক মনে রাখতে পারে ?

আমি এটাও জানতাম না বাবা বরাবরের জন্যই আমাদের ছেড়ে চলে গেল। এর দীর্ঘ দিন পর, যখন বাবার না-ফেরা একটা স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন খেলাৎবাবু লেনে আমাকে বলা হল যে বাবা মরে গেছে। একটা শ্রাদ্ধের আয়োজন হল। মা অনেক কষ্টে রেখে দেওয়া লোহা-শাঁখা জলাঞ্জলি দিয়ে সাদা শাড়ি পড়ল সেদিন। ন্যাড়া মাথায়, বোধহীন মাথায় বিপদের সম্ভাবনা কম দেখে আমি বেরিয়ে পড়লাম সিনেমা দেখতে। ততদিনে আমি স্কুল কেটে সিনেমা দেখায় রপ্ত হয়ে গেছি। কলেজ স্ট্রিটের বাটার পাশের গলিতে জহর সিনেমা হলে আমার বাবার শ্রাদ্ধের রাতে আমি ইন্তেকাম নামের একটা সিনেমা দেখি। রাতে ফিরে পরিবেশগত কারণে আমাকে কোনও প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় না। ১৯৭৪-৭৫ সাল হবে সেটা। গোটা বাড়িতেই একটা নিথর ঘুম-ঘুম ভাব। ঘরের জনসংখ্যা কমে গেছে ততদিনে। বড়দিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে আমার জামাইবাবু। যদিও সেই রঙিলা ভাব ততদিনে মুছে গেছে তার। বড়দি বিস্তর কান্নাকাটি করে স্বামী-সন্তান নিয়ে ফিরে গেছে স্বাধীন বাংলাদেশে। আমিও স্বাধীন আর ঘ্যানরঘ্যান করতে হবে না, বাবা কবে আইব মা ? বাবা আইব না। মার ঠিক কী মনে হয়েছিল আমি জানি না। একটা ষাট পাওয়ারের ঘরে হাঁফ তুলে দিন কাটিয়ে যাচ্ছিলেন দান্দা। রাতে মাঝে-মধ্যে গলা থেকে এক অদ্ভুত শব্দ বেরতো, মা মা। সমস্ত স্বপ্নরা ততদিনে নিশ্চয়ই বিদায় নিয়েছে রায়সাহেবের চোখ থেকে। ছেলেরা তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে তার দায়িত্বজ্ঞানহীন জীবনের কথা, কাটা কাটা চোখা ভঙ্গিতে। গোটা একটা নিরর্থক জীবন নিয়ে গোঙাচ্ছেন পেট্রিয়ার্ক -- মা মা। আমি আর ছোড়দা বিরক্ত হচ্ছি, শুধু মা বিরক্ত হচ্ছে না। 'মা' ছাড়া দান্দার ভোকাবিউলারিতে আর একটি শব্দ থেকে গেছিল, 'চাঁপা'। ডাকলেই মা ছুটে আসত। মা কোনও দিন বেইমানি করেনি। বড়দা করেনি। শুধু আমরাই বিরক্ত হয়েছি, আমি বেশি। একবারও মনে পড়েনি দেশে দান্দার রহস্যময় আলমারির কথা। যেখান থেকে বেরিয়ে আসত আশ্চর্য সব লজেন্স বিস্কুট। ধীরে ধীরে দান্দার বেডসোর হল। শ্লেশ্মার শব্দ বেড়ে যেতে লাগল। হাঁফের টান আর কাশি। একবার বড়দা এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল। দান্দা এক ঘরঘরে গলায় বলল, পল্টু, আমাকে একবার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট সিগারেট খাওয়াবি ? খুব খেতে ইচ্ছে করছে। কান্না সামলে বড়দা বলল, খাওয়াব। কালই নিয়ে আসব। কোন কালে বৃদ্ধ খেয়েছিলেন ওই সিগারেট। কোনও অলৌকিক মায়াবী সময়ে। জানতেন ওই সিগারেট এনে দেওয়ার কষ্ট আর কেউ করবে না। বড়দা করবে। তাই তাকে বলেছিলেন দান্দা। বড়দা এনে দিয়েছিল। কোনও রকমে একবার উঠে বসেছিলেন পেট্রিয়ার্ক। কাঁপা হাতে চোখের পিঁচুটি মুছে ধরিয়েছিলেন

সিগারেট। এমন দমকা কাশি এল তারপর। পারলেন না। আবার শুয়ে পড়লেন। বড়দার চোখে তখন বেদম কান্না। কিন্তু কোনও শব্দ নেই। খুব তৃপ্তির হাসি মুখে নিয়ে ঘুমিয়েছিলেন দান্দা। বেশি দিন বাঁচেনি এরপর।

সম্ভবত পরেশ পোদ্দারের বাড়ি থাকার সময়ই গোবিন্দ নামের সেই দালালের সঙ্গে রফা হয়। 'চিড়া খাইবেন, চিড়া' বলা সেই দালাল গোবিন্দ। বাবার চলে যাওয়া আর গোবিন্দর মুখ আর দিনরাত রাশি রাশি শাপলা (এদেশী ভাষায় শালুক) দিয়ে করা ডাল আর ভাত খাওয়া ছাড়া আর কোনও স্মৃতি নেই দেওভোগের। প্রচুর শাপলা হত ওখানে। বর্ষার অফুরন্ত মূল্যহীন সবজি। এখন বুঝতে পারি পরেশ পোদ্দার ক্রমে হাল্কা হয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর চিন্তিত মুখের অনেক রেখার মধ্যে একটা নিশ্চয়ই ওই নিরন্তর শাপলা খাওয়ার অভিশাপ নিয়ে। শাপলার ডাল, শাপলা ভাজা, শাপলার (হায়, শুধু শাপলারই) সুক্তো। যদিও দু-বেলা আমরা হাপুসহুপুস অংশ নিতাম সেই শাপলা ফেস্টিভালে। একদিন বাড়িতে মাছ এসেছিল, টাটকিনি মাছ। সেদিন অনেকেরই মন রোমান্টিক হয়ে গিয়েছিল। কেউ বোধহয় উদাস হয়ে গেয়েও ফেলেছিল, যারে যাবি যদি যা।

শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি চলছে তখন। যা ছিল একদিন বাড়ির পুকুর, তা আজ নদীর আকার নিয়েছে। সেই নদীর ওপর দিয়ে যাতায়াত করে জেলে ডিঙি, ভদ্রলোকেদের নাও, ভাড়ার নৌকো। এইসব দেখি আর গ্রামের কথা মনে পড়ে। প্রায় একই ছবি দেখা যেত সেখানকার বর্ষায়। বরং সেখানে দৃষ্টি ছিল আরও উন্মুক্ত। এখানকার হোগলা ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখতে হত না ধীরে এগিয়ে যাওয়া ডিঙিটিকে। ভেলায় করে ভেসে যেতাম আমরা। ছোড়দা আর আমি আর পানা মানে প্রাণকেষ্ট। একবার এক চোরা স্রোতে আমাদের কলাগাছের ভেলা বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে পাড়ি দিয়েছিল নদীর দিকে। এক ঘোলাটে প্রবহমান সর্বনাশা জলের দিকে ছুটে গিয়েছিল আমাদের জবুথবু ভেলা। ব্যাপারটা অনেকটা অটোয় চড়ে রোটাং পাস যাওয়ার মতো। ছোড়দা আর পানার দাদা হরেকেষ্টর নৌ-চালনা দক্ষতায় রেহাই পেয়েছিলাম আমরা। সে-সব যেন কবেকার কথা।

দেওভোগে এসে সেসব মনে পড়ে। কিন্তু ভয় করে না। আবার ইচ্ছে করে ওই ভেলায় চড়তে। এই উঠোন, এই বাড়ি থেকে আবার ওই উঠোনে ফিরতে। ভাবনের কিছু নাই। বাবা আইব। সব ঠিক হইয়া যাইব। বাড়ি ফিরা যামু। গিয়ে দেখুম আবার সব আগের মতন হইয়া গেছে। আবার ভেলা ভাসব জলে। আবার সেই জলের টান। সব হইব বাবা আইলে। এই এক ঘুমিয়ে পড়ার আগের বিশ্বাস নিয়ে দেওভোগে দিন কেটেছিল আমাদের।

তবে আবার হঠাৎ এরই মধ্যে হুড়ো খেয়ে বেরিয়ে পড়তে হল। অনেক সময় ধরে

এবার জলে ভাসা। কার্যতই চিড়া আর গুড় খাওয়া। আইখা গুড়, মানে আখের রস থেকে বানানো গুড়, বা খেজুইড়া গুড় না। অদ্ভুত এক নিচু জাতির গুড় খেতে হত সকাল সন্ধ্যা রুটির সঙ্গে। খেসারির ডালের মতো ওই গুড়ও বাড়ির চৌহদ্দিতে আগে ঢোকেনি কোনওদিন। গন্ধহীন ওই চ্যাটচ্যাটে ভেলিগুড় দিয়ে আমরা কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় বেশ বাক্কা-বাক্কা করে চিড়ে সাঁটাতাম। দুটো নৌকোয় করে যাচ্ছিলাম আমরা। কুলের ধার ঘেঁসে যেত নৌকো। গোপনে। রাতে বেশ বীরের মতোই অবশ্য মাঝনদী দিয়ে চলত। ছই-এর ভেতর দুলতে দুলতে ঘুমনোর আগে দেখতাম আকাশভরা তারা। আমি ছিলাম নারীনাওয়ে। অন্য নাওয়ে ছিল দান্দা আর গোবিন্দ। মাঝেমধ্যে কোনও চর দেখা গেলে নৌকো ভিড়ত সেই চরে। সবাই নেমে প্রকৃতির লীলা সামলাত। রুটি সেঁকা হত মাটির উনোন বানিয়ে। খাওয়া হত রুটি এবং সেই ভেলিগুড়।

এর মধ্যে একটি চরে নেমে দুর্গন্ধে পালিয়ে এসেছিলাম। আমাদের আগে আগে চলে যাওয়া পলাতকেরা সেই ভেজা চরে ফেলে গেছে পালানোর চিহ্নগুলো। কত বড় দল ছিল সেটা যে মাটি, বালি আর বিষ্ঠার ভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছিল ? তারাও কি চিড়ে আর ভেলিগুড় খেত আমাদের মতো ?

এরকম অনবরত নৌকোযাত্রায় আমার বার বার মনে হত যেন পেরিয়ে যাচ্ছি দেশ-বিদেশ, পূর্ব পাকিস্তানের দেশ-বিদেশ। ভাবতাম নদীর ওপর দিয়েই যখন যাচ্ছি, তখন নিশ্চয়ই পেরিয়ে যাব পদ্মা-মেঘনা, যে সব নদী জীবনে দেখিনি। আমারই মতো পণ্ডিতদের মুখে শুনেছিলাম পদ্মার জল রুপোলি আর মেঘনার জল মেঘরঙের। একদিন বিকেলে বড় গাঙে পড়ার সময় যখন দূরে দেখলাম কালো জলের উচ্ছ্বাস, মনে হল ব্যস, ওই তো মেঘনা। জীবন সার্থক হল আমার। পরে অবশ্য জেনেছিলাম মেঘনা তো দূরস্থান, পদ্মার ধারেকাছে পৌঁছইনি আমরা। স্বাভাবিকভাবেই, সেদিকে যাওয়া মানে পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রে যাওয়া, যা কিনা আত্মহত্যার সামিল। আমরা যাচ্ছিলাম মূলত নানান শাখা নদী আর খালের ওপর দিয়ে। আমার মনে হয় কিছুটা যশোর আর প্রধানত খুলনা হয়ে আমরা ইন্ডিয়ায় ঢুকি। আমরা কোনও কারণে ভারতকে ইন্ডিয়া বলে ডাকতাম। অথচ কলকাতাকে কিন্তু কেউ ক্যালকাটা বলে ডাকত না। এটা ইদানীংকার বাংলাদেশি বন্ধুদের কথাতেও লক্ষ্য করেছি।

ওই সব খাল-বিল পেরিয়ে আসার সময়ে সবচেয়ে মনের রাখার মতো অভিজ্ঞতা হল এক বুড়ির বাড়িতে থাকা। এখানে বুড়ির বাড়ি নামটা অবহেলার্থে লিখছি না। ওই জায়গাটার নামই হয়ে গিয়েছিল বুড়ির বাড়ি। একটা মাঠের ওপর ঝরঝরে একটা কুঁড়েঘর যেটাকে বাইরে থেকে দেখে লোকে দরিদ্র টয়লেট ভাবতে পারে। বুড়ির ওই ঘরে গোটা একটা দিন-রাত কাটিয়েছিলাম আমরা। আমরা মানে জনা পনের মানুষ। আমাদের সঙ্গে থাকা আরও একটি-দুটি পরিবার, কয়েকটি নির্জীব শিশু-সহ।

বেশিরভাগ সময়েই ঢুলতে থাকা এই বাচ্চাগুলো জেগে থাকার সময়ে ভীষণ খিটখিটে হয়ে যাচ্ছিল। বুড়ির ওই বন্ধ ঘরের থমথমে ভাবের মধ্যে ভয়ঙ্কর লাগছিল ওদের গোঙানির শব্দ। ওদের মুখগুলো প্রাপ্তবয়স্কদের, না বৃদ্ধদের, মুখের মতো দেখাচ্ছিল। অনেকক্ষণ হাওয়া বইছিল না বর্ষার সেই দুপুরে। সব মানুষ ঝিমোচ্ছিল হাঁটুতে মাথা গুঁজে। হঠাৎ একটা কান্নার শব্দ বেরিয়ে এল কোন এক জোড়া হাঁটু থেকে। অদ্ভুত সেই শব্দ। ব্যথা পেয়ে, কষ্ট পেয়ে, এভাবে কাঁদে না মানুষ। তারই সঙ্গে বেরিয়ে এল তীব্র পচা গন্ধ। সব কটা মাথা হাঁটু থেকে উঠল এক মুখ-বাঁকানো নিয়ে। একদম বার্গম্যানের ছবির মতো দমবন্ধ সেই সিচুয়েশনে ঋত্বিকের ছবির মতো চরিত্র বলে উঠল, পারে নাই। হাইগা ফালাইছে।

ওই ঘরের বাইরে বেরোতে নিষেধ ছিল আমাদের। কোনও ভয় ছিল বাইরে কোথাও। একজন মোটাসোটা অসহায় মহিলা পারেননি তাঁর যন্ত্রণার কথা কাউকে জানাতে। শেষে আর না পেরে কেঁদে ফেলেছিলেন। বিষ্ঠার গন্ধে ভরে গিয়েছিল ঘর। আর কোনওদিন মহিলাকে দেখিনি তার পরে।

পর্ব ৭

'দ্যাখো মাতা সরস্বতী, ছাগলে গিলেছে হাতি/আর ইন্দুরেতে বিড়াল ধইরা খায়/গাঁজার নাওয়ে আগুন দিয়া যায়।' এই অপূর্ব গানটির স্রষ্টা কে আমি জানি না। জামাইবাবু তার রসবোধের পরিচিয় দিতে এ-গান গেয়ে শুনিয়েছিল বিয়ের পর পর। আমরা সব ভোলাভালা তেল-চকচকে শালারা এ-গান শুনে জামাইবাবুর ফ্যান হয়ে গিয়েছিলাম একদিন। পালানোর সময় নদীর ওপর দিয়ে যেতে যেতে এ-সব মুহূর্তের ছবিও ফিরে আসত মনে। ঘুম থেকে জেগে উঠে অল্প দুলতে থাকা নৌকোয় বসে মনে হত বাড়ি ফিরছি। প্রত্যেকটা যাত্রাই ছিল বাড়ি ফেরা। অথচ জানি যে আমরা পালাচ্ছি। আবার বাড়িও ফিরছি যেন ঘুম আর জেগে থাকার বিষাদলগ্নে।

খুব দীর্ঘ সেই নদী পেরনো। ক্রমে সব সময়ের এক ঢুলুনি শরীরে। অদম্য ইচ্ছে ঝাল খাবার, টক খাবার। শুধু ভেলিগুড় আর চিড়ে আর কখনও-সখনও রুটি খেয়ে চলেছে দু-বছরের শিশুও। বেশিরভাগ সময় ঘুমোচ্ছে সে এবং তার সদ্যোজাত ছোট ভাই। জেগে উঠছে প্রাকৃতিক কারণে, খিঁচ-খিঁচ করছে। আবার নেমে আসছে কম খেয়ে ঘুমনোর ঘোর। এভাবে এক লম্বা পথ পার হয়ে আমারা পৌঁছলাম ইদিলপুর। এবার আশ্রয়দাতা মাখন সরখেল। বোধয় উনিও বাবার বন্ধু ছিলেন। খালি গা, ফর্সা রঙ, রীতিমতো সুদর্শন মাখন সরখেল। একটা ধুতি পরে থাকতেন লুঙ্গির মতো

করে। বুকের একপাশ থেকে অন্য পাশে ঝুলতো ব্রাহ্মনের ধবল তরবারি, অথচ ধান্দার পৈতে তখন ম্লান।

মাখন সরখেল এবং তাঁর এক বিধবা বোন খুব আদরযত্নে ডেকে নিলেন আমাদের। তাঁর স্ত্রী তখন ছিলেন কলকাতায়, চিকিৎসার জন্যে। দিলুদা আর পুনুদা -- ওঁদের দুই ছেলে -- মোটামুটি ছোড়দার সমবয়েসি। ওরা মুহূর্তেই জমে গেল আর আমরা বসে গেলাম ভাত খেতে। আ-হ্, কী ভাত। কী সুন্দর মোলায়েম গভীর শীতের লেপের মধ্যে মার দিকে ঘেঁষে যাওয়ার মতো তার ওম। ভাত -- ওঃ ভাত। তার সঙ্গে ডাল, তরকারি, কাঁদিয়ে দেওয়ার মতো মাছ। হ্যাঁ হ্যাঁ মাছের ঝোল। এক শেষ দুপুরে ভেলিগুড় আর চিড়ের সমস্ত ম্লানিমা তুচ্ছ করে খাওয়া ভাতের সেই ঘ্রাণ এই চুয়াল্লিশ বছরে পৌঁছেও কী-যেন একটা কম্মো করে চোখ আর হৃদয়ের কোণে কোণে। আমরা উন্মাদপ্রায় জলাজমির কিছু মানুষ অমৃতপান করি। একটু বেশি পরিমানেই। রাত থেকেই সবাইয়ের পেট খারাপের খবর পাওয়া যায়।

বেশ অবস্থাপন্ন মানুষ ছিলেন সরখেলরা। আমাদের মতো পড়তির বাদশা নয়। অনেকটা জায়গা জুড়ে দালানবাড়ি। গাছপালার যত্ন নেওয়া হত। পুকুর ছিল বেশ গভীর। আমি আমার টলমল বড় ভাগনেকে নিয়ে যথাসাধ্য খেলাধুলো করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তাতে মন ভরত না। আমার চোখ পড়ে থাকত ছোড়দার দিকে। ও দিলুদা আর পুনুদার সঙ্গে সব সময়েই বেশ মশগুল থাকত। আমাকে একবার ডাকলেই আমি কৃতার্থ বোধ করতাম। কিন্তু ডাকত না ওরা। এক রহস্যময় ভাষায় কথা বলত নিজেদের মধ্যে। ট্রান্সিস্টরে গান এবং নানা প্রোগ্রাম শুনত। আমার উপস্থিতি ভাল লাগত না ওদের। ছোড়দা তো দেখলেই তাড়িয়ে দিত। ওদের তিনজনের বয়েস তখন চোদ্দ থেকে ষোলর মধ্যে। পরে আন্দাজ করি ওরা প্রেম-ভালবাসার চৌকাঠে পৌঁছে তখন যৌবনের ডাক শুনছে। কোনও একটা প্রোগ্রামকে একবার পুনুদা অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলেছিল, 'ঝিলিমিলি নাগেডাঙা প্রোগ্রাম -- শবনম'। নিশ্চয়ই 'নাগেডাঙা' বলে কোনও কথা থাকতে পারে না। কিন্তু সেই প্রোগ্রাম আমার কোনওদিন শোনা হয়নি। দুপুরের দিকে হত সেই অনুষ্ঠান। তিন কিশোর ট্রান্সিস্টর নিয়ে উধাও হয়ে যেত কোথাও। গভীর হতাশায় এবং কোনও এক দিন সেই অনুষ্ঠান শুনতে পাব এই ভরসায় আমিও ডেকে উঠতাম 'ঝিলিমিলি নাগেডাঙা প্রোগ্রাম -- শবনম'।

রেডিওর সঙ্গে যোগাযোগ শিশুবয়েস থেকেই। কলকাতা ক-এর হিট অনুষ্ঠানগুলো মিস নেই। শনিবার আর রোববার দুপুরের নাটক, রোববার রবীন্দ্রনাথের গান শেষ হতে না হতেই আবহাওয়ার সংবাদ আর তখনই শুরু হয়ে যেত প্রস্তুতি, এবার নাটক। বিবিধ ভারতী বস্তুটি জানা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের গান চলত দিনরাত। বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত বাড়ির মতো কোলাহলও চলত একসঙ্গে। কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে গান

থাকাটা এখন মনে হয় বেশ ভাল ছিল। আমাদের বাড়িতে সব মিলিয়ে এক ধরনের সাংস্কৃতিক বাতাবরণ ছিল। বাবাকে এক হাতে বদনা আর অন্য হাতে ছাপানো বা খবরের কাগজের পাতা বা নিদেনপক্ষে পঞ্জিকা নিয়েও যেতে দেখেছি বাথরুমের দিকে। 'বাথরুম' কথাটা লক্ষ করার মতো। ব্যাপারটা মূলত বাড়ি থেকে বেশ কিছু দূরে জঙ্গলের মধ্যে খাটা পায়খানা।

মা বোধহয় প্রথাগতভাবে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েছিল। কিন্তু সর্বক্ষণ বই নাকে নিয়ে বসে থাকতে দেখেছি। আমরা দু-ভাইও অতটাই বই-পাগল ছিলাম। যা খুশি পড়তাম, কেউ বাধা দিত না। একবার শরৎচন্দ্রের কোনও একটা বইয়ে 'বেশ্যা' কথাটি দেখে (কাশীনাথ কি ?) বড়দিকে মানে জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং চড় খেয়েছিলাম। বড়দি অত বই পড়ত না। তাই চড় মারত বোকার মতো। ছোড়দা ওর স্কুল লাইব্রেরি থেকে একবার দানবীর কার্নেগি নামের একটা বই এনেছিল। ভেবেছিলাম কোনও দানবিক কান্ড নিয়ে বই। দু-এক পাতা পড়ে বিশ্রী লেগেছিল। ডেল কার্নেগির জীবনী মুগ্ধ করেনি আমাকে। বাড়িতে পুরোনো বিচিত্রা, প্রবাসী, বসুমতী এবং ভারতবর্ষের বাঁধানো সংখ্যা ছিল অনেক। সেগুলো পড়ে পড়ে চচ্চড়ি করে ছেড়েছিলাম। ভারী সুন্দর সাদা-কালো ছবি ছিল পাতায় পাতায়। আমাদের বাড়ি লুন্ঠনকারীরা কি সে-সব পত্রিকায় ভবিষ্যতের মুড়ির ঠোঙার সম্ভাবনা দেখেছিল ?

প্রথম দিকে পড়তাম শব্দ করে। পড়ে বড়দের দেখে দেখে নি:শব্দে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। কী বুঝতাম ভেবে লাভ নেই। পড়া ছিল সব, সব কিছু। এছাড়া পড়েছিলাম বাড়ি থেকে পালিয়ে, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের একাধিক বই ; যার মধ্যে জেরিনার কণ্ঠহার-এর ভিলেন মেয়েলী গলার অবলাকান্ত খুব আনন্দ দিয়েছিল। শশধর দত্তের দস্যু মোহন সিরিজ গিলেছিলাম উন্মাদের মতো। পরবর্তীকালে ঠাট্টা শুনেছি সেই সব উপন্যাসের সমাপ্তি নিয়ে। 'ইন্সপেক্টর বেকার ঘরটি ঘিরিয়া ফেলিয়াছেন পুলিশে। পলাইবার পথ নাই। মোহনকে এবার ধরা পড়িতেই হইবে। কোথা হইতে কী হইল, ঘর ধুঁয়ায় ভরিয়া গেল, দস্যু মোহন পলাইয়া গেল'। এছাড়াও শুনেছি, 'মোহন এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে ছোরা আর এক হাতে পিস্তল লইয়া দুর্বৃত্তকে আক্রমণ করিল।' এরকম লাইন সত্যি ছিল কিনা আমার মনে নেই। তবে মোহন যে তার স্ত্রী রানীকে 'প্রিয়ে, প্রিয়তমে' বলে তার বলিষ্ঠ বাহুর মধ্যে টেনে নিত, এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। পরে মোহনের ছেলে স্বপন বড় হয়ে মোহনের জায়গা নিতে গিয়েছিল, কিন্তু মোহনের গ্ল্যামার যায়নি মন থেকে। অভিষেক পারেনি দিওয়ারের অমিতাভকে ভুলিয়ে দিতে।

প্রসঙ্গত বাংলা লাইভের পাঠকদের কাছে অনুরোধ : ওই সাত-আট বছরে আমি একটা বই পড়েছিলাম। বইটার নাম সাইবেরিয়ার পথে। লেখকের নাম জানি না, প্রকাশকের নাম জানি না। মার্ক (মারক লেখা ছিল) নামের এক সাহেব আর চন্দ্রনাথ

নামের এক বাঙালি ছেলের গল্প ছিল ওটা, যারা নানান অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে দিয়ে সাইবেরিয়া পৌঁছেছিল। ওই বইটার ব্যাপারে যদি কেউ কোনও তথ্য দিতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ থাকব। আর বইটা যদি একবার পাই, আমি জানি না কী করব।

তাই রেডিও-র 'নাগেডাঙা' রসে বঞ্চিত আমি বই-এর খোঁজ করতাম। কিন্তু কোনও বই পড়ার স্মৃতি নেই না ও বাড়িতে। একা ঘুরে বেড়ানোর কথা মনে আছে। পুকুরপাড়ে বসে থুম হয়ে জলের দিকে তাকিয়ে থাকার কথা মনে আছে। আর মনে আছে প্রথম খেলিয়ে মাছ ধরার কথা। জীবনে প্রথম হুইল-লাগানো ছিপ নিয়ে জলের ধারে বসেছিলাম এক দুপুরে। চোখ ফাৎনায় স্থির। হঠাৎ আলোড়ন জাগল জলে। হ্যাঁচকা টান। মনে হল দৌড়ে পালাই। আগে বিস্তর পুঁটি, ট্যাংড়া আর বৌজা মাছ ধরেছি। কিন্তু হুইল ছিপ এই প্রথম, হ্যাঁচকা টান এই প্রথম। নিজেকে সংযত করে সুতো ছাড়তে লাগলাম। ভয় করছিল, শেষে যদি বড়শিতে উঠে আসে কেউটে সাপ যে আমার সাহসে স্তম্ভিত। আমার আট বছরের জীবনে যে মৃগেল উঠে এল ক্লান্ত শরীর নিয়ে, যাকে আমি কাঁপা হাতে বড়শি খুলে বাটিতে রাখলাম, এখন মনে হয় সে কোনও বড় মাছ নয়। কিন্তু বাটিতে ঝাপটানো সেই মৃগেলকে আমার প্রতিহিংসাপরায়ণ এক শত্রু বলে মনে হয়েছিল। খুব ভয় করছিল বাটি-সহ তাকে বাড়িতে নিয়ে আসার সময়। আমার যিবনের প্রথম মাছ খেলিয়ে তোলা কৃতিত্বের জন্য মাখন সরখেল আমার প্রশংসা করলেও ছোড়দার উদাসীনতা আমায় দুঃখ দিয়েছিল।

আমার স্বভূমিতে ধর্ম নিয়ে কোনও মাথাব্যথা ছিল না বাড়িতে। কিছু কিছু আচার পালন করা হত ঠিকই, ব্রত-উপোসের মতো। কিন্তু ধর্ম আলাদা করে তেমন কোনো মাত্রা যোগ করেনি আমাদের মনে। মাখন সরখেলের বাড়িতে প্রথম আমরা অনুভব করি ধর্মের প্রভাব। প্রতিদিন বাবা এবং ছেলেরা একত্রে এক বিশেষ সময়ে গান গাইত, 'গুরুদেব, দয়া করো দীন জনে'। ঘরে ধূপ জ্বলত। মাখন সরখেল এবং তাঁর পুত্রেরা স্নান করে, খালি গায়ে ঠাকুরঘরে বসে চোখ বন্ধ করে জোড় হাতে গাইতেন এই গান। আমরা মুগ্ধ হতাম।

দীর্ঘদিন শাপলা, ভেলিগুড়, শাক আর রুটি খেতে অভ্যস্ত চক্রবর্তী পরিবার খুব ভাল খাবার পাচ্ছিল ওই বাড়িতে। দান্দার গলা ক্রমে চলে যাচ্ছিল পুরোনো ব্যারিটনে। ওখান থেকে বেরিয়ে আবার কোনও অনন্তযাত্রায় যেতে চাইছিল না মন। আবার ফিরে এসেছিল রাত এবং দুপুরের নাটক শোনা, অনুরোধের আসর আর রেডিওর ডাকে জেগে ওঠা। আমরা বুঝতে পারিনি কীভাবে মাখন সরখেলের ওপর চাপ বেড়ে উঠছে। কীভাবে আঞ্চলিক বেইমান এবং প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী তাঁর কাছে চাইছে আরও আরও টাকা। প্রোটেকশন মানি। এইসব দাড়িওয়ালা গোঁফহীন স্বঘোষিত রক্ষকের হাতে তুলে দেওয়া হত বন্দুক। পাকিস্তানের সমর্থক নাকি এরা। এই সব গুন্ডারা। গড় উচ্চতা পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি, শিক্ষা শূন্য, দেশপ্রেম শূন্য, কিন্তু হাতে বন্দুক আছে

আর আছে টাকার লোভ। এরা কখনও-সখনও ঢুকত বাড়িতে। এদিক-ওদিক তাকাত মহিলাদের দেখার আশায়, উঠোনে বাচ্চার পুরোনো বল পড়ে থাকলেও তুলে নিয়ে যেত। এরা আসবে খবর পেলেই বাড়ি শুনসান। শুধু মাখন সরখেল এগিয়ে যেতেন নির্ভয়ে। কথা বলতেন, বোঝাতেন, টাকা দিতেন। এরা চারপাশ দেখতে দেখতে চলে যেত। গা শিরশির করে উঠত ওদের দেখলে -- ভয়ে তো বটেই, ঘেন্নায়ও। এদের মধ্যে কারও কারও বয়েস হয়তো আজ পঞ্চান্ন-ষাট। অনেকেই বেঁচে আছে নিশ্চয়ই। হয়তো সসম্মনেই বেঁচে আছে স্বাধীন বাংলাদেশে, বা বিদেশে। সেখানে থেকেও এরা ভারতের দাদাগিরির প্রতিবাদ করে চলেছে।

সাধারণত এরা এসে, টাকা নিয়ে, কথা শুনে বা না-শুনে চলে যেত। একদিন দুপুরে এরা এসেছিল একটু অন্যরকম মুডে। বেশ ভ্যাপসা সেই দুপুর আবার বদলে দিল আমাদের ভবিষ্যৎ। এই প্রথম চোখের সামনে রক্তক্ষরণ দেখলাম। এটা দেখা বাকি ছিল। হত্যা দেখা বাকি ছিল। দেখলাম।

পর্ব ৮

বর্ষায় যেদিন বৃষ্টি হয় না সেদিন যেমন একটা থমথমে ভাব থাকে চারপাশে তেমন কিছু দিন আসত তখন। আমার মনে হয় সেটা হল বর্ষার শেষ প্রহর। পূর্ব পাকিস্তানের দু-কূল ছাপিয়ে আশ্বিন আসব আসব করছে। কদিনের মধ্যেই এসে যাবে অদ্ভুত এক সোনালি রঙের চাদর গায়ে শরৎ। এখনও কোনও বিচিত্র কারণে যে দুর্গাপুজোর দিন মনে পড়ে, তার সঙ্গে এসে যায় শস্যের গন্ধ, খুব ধীরে ধীরে শেষ বিকেলে টু-কি দিতে শুরু করা চোরা শীতের কাব্য, কে জানে ?

সেই আশ্বিন আসেনি। ভাদ্রর গরম দুপুরে এসে দাঁড়াল আমাদের প্রোটেকশন দেওয়ার মালিকেরা। লুঙ্গি-পরা কতগুলো নোংরা চোখের লোক। মাখনজ্যাঠা উবু হয়ে মাটিতে কোনও চারা গাছের যত্ন নিচ্ছিলেন। খুব কাছ থেকে দেখছিলেন, স্পর্শ করছিলেন ওঁদের। এই এক পরিবার ছিল তাঁর। উদ্ভিদের পরিবার। মাঝে-মধ্যে এত কাছে যেতেন ওদের যে মনে হত কথা বলছেন গাছের ডাল বা চারা বা কুঁড়ির সঙ্গে। দুপুরে খাওয়ার পর না ঘুমিয়ে তিনি ওইসব করতেন।

লোকগুলো যথারীতি এদিক-ওদিক দেখছিল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে ওদের মধ্যে মাতব্বর লোকটি হাসল তার লাল-কালো, ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত বের করে। অত কুৎসিত হাসি আমি বেশি দেখিনি। অত ভয়ঙ্কর, যাকে ইংরেজিতে বলে ম্যালিশাস, চাহনি দেখিনি কোনওদিন। মাখনজ্যাঠা উঠে দাঁড়ালেন সম্ভবত আমার আতঙ্কিত চোখ

দেখেই। এগিয়ে গেলেন ওদের দিকে। ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগোলেন গেটের দিকে, যেখান থেকে ডানদিকে কিছু দূর গেলেই বাড়ির শ্মশান। সেই দিকেই চলে গেলেন তিনি ওদের সঙ্গে।

খুব ভয় করছিল আমার। কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে এগোতে লাগলাম। একটু দূরে থেকে দেখতে পেলাম সবাই বেশ হাত-পা ছুঁড়ে কথা বলছে। মনে হল ঝগড়া বেধেছে। আরও একটা জিনিস লক্ষ করলাম। ওদের মধ্যে একটা লোকের হাতে বন্দুক। উঠোনে কথা বলার সময় একটা হাত সে পেছনে রেখেছিল। আমি ভেবেছিলাম লাঠি। আগে ওদের হাতে লাঠি দেখেছি। এখন বুঝলুম ওটা বন্দুক। বন্দুকের ছবি দেখেছিলাম অনেক। জানতাম যে গুলি ছোঁড়ার সময় কাঁধের সঙ্গে বন্দুকের কুঁদো লাগিয়ে ট্রিগার টিপতে হয়। না হলে ধাক্কা লাগতে পারে। আরও চমকপ্রদ লাগত রাইফেলের নাম, যা কিনা পাকিস্তানি মিলিটারির ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করা হত। স্টেনগান, ব্রেনগান, টমি গান এই সব নাম বরাবর কানে মধু ঢেলে এসেছে।

কিন্তু আজকের দৃশ্যের মানে অন্য। একটা গলা শুকনো ভাব, আতঙ্ক আর এক ভয়ানক কৌতূহল আমাকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল ওদের চলা রাস্তায়। আট বছর বয়েসে যতটা লুকনো সম্ভব নিজেকে ততটাই লুকিয়ে, এক গাছ থেকে অন্য গাছের পেছনে দৌড়ে চলছিলাম। একটা লোক বার বার এদিক-ওদিক, বিশেষ করে পেছন দিকে, দেখছিল, যেখানে আমি নিজে নিজেই এক গা ছমছমে লুকোচুরি খেলা খেলছিলাম।

দলটা গিয়ে থামল সেই শ্মশানের কাছেই। আমি লতা-পাতা-ঝোপঝাড় মাড়িয়ে পৌঁছলাম সেখানে। মাত্র কুড়ি হাত দূরত্বে, তবু শোনা যায় না কিছু। শুধু আভাস পাওয়া যায় উত্তেজনার। বন্দুকধারী এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ আমাকে দেখে ফেলে। আমি পালানোর আগেই ধুড়ধাড় দৌড়ে এসে সে ধরে ফেলল আমাকে। তারপর প্রায় ছাগলের বাচ্চা টানার মতো করে আমায় টেনে নিয়ে গেল প্রধান দলটির দিকে। মাখনজ্যাঠা আমায় দেখে স্তম্ভিত। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই বন্দুকধারী আমায় টেনে নিয়ে গেল শ্মশানের ঠিক মাঝখানে। পেছন থেকে আমার মাথা ঠেসে ধরল মাটিতে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম আমার মাথার ঠিক পেছনে সে ঠেকিয়ে দিয়েছে বন্দুকের নল। আমি হাউ হাউ করে কাঁদছিলাম, মার কাছে যেতে চাইছিলাম এবং পেছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারছিলাম আমার কান্না ওদের ওপর কোনও চাপ তৈরি করছে না। আমি বুঝতে পারছিলাম ওরা খুশিই হচ্ছে আমার প্রতিক্রিয়ায়।

মাখনজ্যাঠার চিৎকার শুনতে পেলাম, 'অরে চাইড়া দে। যা কওয়ার আমারে ক'।

মাটিতে ঘষটে যাচ্ছে আমার কপাল। রক্তও পড়ছে অল্প অল্প। আর সর্বগ্রাসী এক

ভয়, মৃত্যুর, আমাকে ভীষণ স্বার্থপরের মতো বলে চলেছে, 'আমি বাঁচুম। আমারে বাঁচতে দাও। সক্কলেরে মাইরা ফালাও, খালি আমার বাঁচতে দাও।' এই প্রার্থনা কাজ দিল দৈববাণীর মতো। বন্দুকওলা আমায় ছেড়ে দিয়ে তাক করল মাখন সরখেলের মাথা। আমি ভ্যাঁ করে কাঁদছি দাঁড়িয়ে। সে শুধু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চুপ থাক'। চিৎকার করেনি ও, চোখ রাঙায়নি, কিন্তু আমি চুপ করে রইলাম। আমার মনে হল আর একবার কাঁদলেই ও আমায় মেরে ফেলবে।

এতক্ষণ কথা বলছিল মাতব্বর লোকটা। এবার পুরো ঘটনার দায়িত্ব নিল ওই বন্দুকধারী। এখন বুঝি, বিভিন্ন কারণে প্রধানের পক্ষে নিষ্ঠুর হওয়া সম্ভব ছিল না। তার মধ্যে একটা কারণ চরিত্র। মাতব্বর ছ্যাঁচোড় টাইপের লোক ছিল, কিন্তু খুনে ছিল না। সবাই পারে না খুনে হতে। এই অসুবিধা দূর করার জন্যেই হয়তো স্পেশালিস্টকে নিয়ে আসা হয়েছিল। তার আত্মবিশ্বাস, মুহূর্তে আপাত দলনেতার হাত থেকে কর্তৃত্ব কেড়ে নেওয়ার ভঙ্গি এমনকি ভাবালো মাখনজ্যাঠাকেও। তিনি সতর্ক চোখে তাকাল লোকটার দিকে। তারপর মাতব্বরকে বললেন, 'ও কে ? অরে তো চিনি না'।

'ও আমাকে লোক। ক' হাসান। তুই এই বার কথা ক'। আমার কথায় দেহি কাম হয় না।'

এই বলে মাতব্বর ব্যাকস্টেজে চলে গেল। এমন এক ভঙ্গিতে যেন তার হুকুমেই চলছে হাসান। সে অবসরপ্রাপ্ত ডনের ঔদার্য দেখিয়ে মার্লন ব্র্যান্ডোর মতো সরে গেল। অ্যাল প্যাচিনোর জায়গা নিল এক ভাড়াটে খুনে। অ্যাসাসিন। আন্তোনিও ব্যান্দেরাস। হাসান লুঙ্গির খুঁটি শক্ত করে বেঁধে ইচ্ছে করেই যেন তার পুরুষাঙ্গ একটু চুলকে নিয়ে বলল, মাখন সরখেলকে, তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্ব, আভিজাত্য উপেক্ষা করে বলল, 'ট্যাহা দে'।

আগে কেউ এভাবে, এত বিশ্রীভাবে 'তুই' সম্বোধন করেনি। মাখনজ্যাঠার মুখ থমথমে হয়ে গেল।

'তুই কেডা ? তর লগে কথা কউম না আমি।' এই বলে মাখনজ্যাঠা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি বাসায় যাও।'

হাসানও সহমত হল তাঁর সঙ্গে, 'যা গিয়া, দৌড় দে হালার পো হালা' বলে বন্দুক তুলল আমার দিকে।

পাঠকবন্ধুরা, মৃত্যুভয় বিষয়টি ঠিক কী তা নিয়ে কোনওদিন ভেবেছেন আপনারা ?

আমি রোগে মৃত্যুর কথা বলছি না। এমন কি ক্যান্সার-রোগীরও মনে প্রত্যাশা থাকে। ছ-মাস থেকে ছ-বছর থেকে অনন্তকাল বেঁচে থাকার প্রত্যাশা। হয়তো এরই মধ্যে পাওয়া যাবে এক আশ্চর্য ওষুধ যা তাকে ফিরিয়ে আনবে জ্যান্ত মানুষের পৃথিবীতে। তা যখন হয় না, যখন কিমোথেরাপির দহনে ক্রমে ছোট হয়ে আসে তার শরীর, ততদিনে সে তৈরি হয়ে গেছে মৃত্যুর জন্য। সে এক রকমের নিষ্ঠুর মৃত্যু। আর এক রকমের মৃত্যু আছে। মুহূর্তে বুঝতে পারা যে মৃত্যু এক্ষুনি আসবে। এক সেকেন্ড সময় নেই অপেক্ষা করার। পলাইয়া যা। মাইরা ফালাইব তরে। এক হাতে কপালের রক্ত মুছতে মুছতে অন্য হাতে পেন্টুল সামলিয়ে দে দৌড়। বার বার মনে হচ্ছে পেছন থেকে এই এল গুলিটা। একটা শব্দ। আমার পড়ে যাওয়া। বাঁচার ইচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন এবং তীব্র।

কিন্তু কিছুটা পালিয়ে এসেও যখন এসব কিছু হল না, তখন ফিরে তাকালাম শ্মশানের দিকে। বুক হিম হয়ে গেল এক দৃশ্য দেখে।

পর্ব ৯

বন্ধুরা, আপনারা কাউকে কখনও খুন হতে দেখেছেন ? মৃত্যুর কথা বলছি না। এমন মানুষ হয়তো নেই যে জীবনে কোনওদিন কোনও মৃত্যু ঘটতে দেখেনি। আমি হত্যার কথা বলছি যাতে সিনেমার দুর্দান্ত কাট নেই, বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে নেওয়া শট নেই, স্লো-মোশনে মৃতের একরাশ বিপন্ন বিস্ময় চোখে নিয়ে গদগদ ভঙ্গিতে মাটি নেওয়া নেই। কোনও ব্যাকগ্রাউন্ড ট্র্যাক নেই। যে মৃত্যু অনেকটা ক্রিকেটারের স্লিপে নিশ্চিত ক্যাচ দিয়ে আউট হয়ে যাওয়ার মতো। সেই মুহূর্তমৃত্যু যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন, কী অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য একজন জীবিত মানুষের হঠাৎ খুন হয়ে যাওয়া। টিভি দেখে, শুধুই টিভি দেখে, বড় হওয়া মানুষ হয়তো অ্যাকশন রিপ্লে চাইতে পারেন মনে মনে। আমি পারিনি। আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি যে মাখনজ্যাঠা আর নেই।

আমি কী কী দেখেছিলাম ? প্রথম দৃশ্য, মাখনজ্যাঠা দু-হাত ওপরে তুলে আছেন। হাসান তাকে কিছু বলছে যা আমি শুনতে পাচ্ছি না। পেছন থেকে দেখছি আমি। কাট টু, মাখনজ্যাঠা ধীরে ধীরে বসে পড়ছেন মাটিতে। কাট টু, তিনি প্রণাম করছেন শ্মশানে। প্রত্যেকটা কাট মানে আমার চোখের পাতা পড়া। কাট টু, বন্দুকধারী বন্ধুক তুলছে। টানা শট। আমার চোখের পাতা পড়ছে না, একটা গুলির শব্দ। কাট টু, মাখনজ্যাঠা লুটিয়ে পড়ছেন সামনের দিকে। শিশুর মতো। যেভাবে ঘুমন্ত শিশু বাবা-মার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, ঠিক সেভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। দু-হাতে

নিজের মুখ চেপে ধরলাম। গোঁ গোঁ শব্দ আটকাতে। এবার খুব দ্রুততায় এদিক-ওদিক দেখে পালিয়ে গেল খুনের দল। তারা দৌড়ে পার হয়ে গেল প্রধান দরজা। আমি মাটিতে পড়ে চিৎকার করতে লাগলাম।

হাসান নাম ছিল না লোকটার। ওর নাম আমার মনে নেই। হাসান, আকবর, হুসেন যা খুশি হতে পারে। কিন্তু ইদিলপুরের মাখন সরখেলের খুনী সম্ভবত আজও বেঁচে আছে। ষাট পেরিয়ে হয়তো তার বয়েস। জানি না ইসলামিক গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন বাংলাদেশে সে কী নামে চিহ্নিত। বিশ্বাসঘাতক না স্বাধীনযোদ্ধা ? দুটোই সম্ভব বন্ধুগণ। কাঞ্চনদার মতো মুক্তিযোদ্ধাকে ধরিয়ে দিয়ে যারা বেঁচে থাকতে পারে, তারা না ইসলামের চিন্তা করে, না গণপ্রজাতন্ত্রের। আমরা মনে মনে যতই চাই তাদের কুষ্ঠ হোক, এমন ভয়ঙ্কর মৃত্যু হোক যাতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে 'আল্লা হো আকবর' বলতে পারি, কিন্তু অশিক্ষিত মৌলবাদীর কাছে সে-ই হয়তো প্রকৃত নেতা। দু:খের কথা এই যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয় বাংলাদেশ, অথচ এর চেয়ে শ্রদ্ধার সেকিউলার দেশ আর কোনটা হতে পারত ? এমন এক আশ্চর্য পরিবেশ তৈরি করা যেত যেখানে রাম আর রহিম শুধু এক ভাষায় কথা বলে তাই নয়, তারা একভাবেও কথা বলে। যে ভাষা বুঝতেন মুজিবুর রহমান। ভাবও বুঝতেন। আজ তা এক ভুলে-যাওয়া ভাষা। এক ভুলে-যাওয়া ঐতিহ্যের জলাজমি পড়ে আছে পশ্চিমবঙ্গের পুব দিকে। যে দেশে ঘরবাড়ি খাক করে আমরা দালালের হাত ধরে পৌঁছই স্বাধীন ইন্ডিয়ায়। শামসুর রহমান বুঝেছিলেন বহুদিন আগে। 'তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা, আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায় ?' বসিরহাটে, বনগাঁয় গরুচোরের সঙ্গে লড়াই করছে দু-দেশের সীমান্তসান্ত্রীরা। মাখন সরখেল অথচ এখনও নেগেটিভের মধ্যে দিয়ে আমায় দেখা দেন। যত বয়েস বাড়ছে, ততই দেখছি ওঁকে। ততই মনে পড়ছে ভিটেমাটির কথা। না আছে সে ভিটে, না সে মাটি। তবু এ-সবই হয়তো নির্মাণ করছে এক অপরাহ্ন। আমি আবার সেই বালকের মতো চাইছি ওই লোকটির মৃত্যু, যার নাম হাসান ছিল না হুসেন তাতে কিছু যায় আসে না আমার।

একটা কেমন যেন ঘোরের মধ্যে সময় কেটেছিল এরপর। তার পরের কোনও ঘটনাই মনে পড়ে না। কীভাবে দাহ হয়েছিল মাখনজ্যাঠার, আমাদের ওপর কতটা সন্ত্রাসের ছাপ পড়েছিল এতে, মনে পড়ে না। শুধু দিলুদা আর পুনুদার গুরুদশাগ্রস্ত চেহারা মনে পড়ে। আবার শুরু হয় আমাদের বানভাসি যাত্রা। আবার নদী, আবার জঙ্গল এবং আবার ইতি-উতি চেয়ে দেখা রাস্তায় নামি আমরা। মাখন সরখেল একটা মারাত্মক ট্রমা-র দৃশ্য হয়ে আজও গেঁথে আছেন মনে।

পরে এই পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে আবার দেখা হয় কলকাতায়। পাইকপাড়ায় দু-নম্বর বাসস্ট্যান্ডের ধারে একটা বাড়িতে থাকতেন ওঁরা। সে পরের কথা। সময় তখন আর একটু এগিয়ে গেছে। আমরা ধীরে ধীরে রেফিউজি জীবনে অভ্যস্ত হতে আরম্ভ

করেছি। এমনকি মেনে নিতে শিখেছি যে দ্যাশে আর ফিরা যাওন নাই।

খেলাৎবাবু লেন-এও পুজো হত। পবনকাকার দোকানের সামনের মোড়ে বাঁধা হত প্যান্ডাল। সেখান থেকে সোজাসুজি একটা রাস্তা গিয়েছিল টালা পার্কের দিকে। আর একটা রাস্তা গিয়েছিল বাঁদিকে বেশ কিছুটা। তারপর ডান হাতে ঘুরে সে টালা পার্কের ঠিক মুখোমুখি হত। সেসব রাস্তা দেখিনি দীর্ঘ দিন। প্রায় তিরিশ বছর। ওই দুর্গাপুজোর প্যান্ডালে বসে থাকার সময় মনে পড়ত দেশের পুজোর কথা।

একটিই প্রধান স্মৃতি ছিল। কোনও এক তখনই প্রায়-বিস্মৃত ভোরে স্থলপদ্ম কুড়োতে যাওয়ার স্মৃতি। কোথায় পুজো হত তাও মনে নেই। মনে হয় বাজারের কাছে। এক ভোরে জেগে উঠেছিলাম ছোড়দা আর আমি। শরতের শুরু। ওঃ, সেই ঋতু জীবনে শুধু একবারই আসে। এত সবুজ এত মারাত্মক সবুজ ছিল দেশটা যে চোখে ঘোর লেগে যেত। বাড়ির পাশেই জঙ্গল। সেখান থেকে একটা গ্রাম্য শর্টকাট ছিল প্রধান সড়কে যাওয়ার। সেখানেই পেয়েছিলাম হালকা গোলাপি রঙের সেই ফুল। পরে অনেক অনেক দিন পরে, শঙ্খ ঘোষের কবিতা পড়ে আমার সেই ভোরবেলার কথা মনে পড়েছিল : পদ্ম, তোর মনে পড়ে, খালযমুনার এপার-ওপার/রহস্যনীল গাছের বিষাদ কোথায় নিয়ে গিয়েছিল ?

হয়তো সে বিষাদ ছিল জলপদ্মের। হয়তো সে গল্প ছিল পদ্ম নামের কোনও হারিয়ে যাওয়া মেয়ের, যে কিনা পরে শ্যামবাজারে সবার হাতে ঘুরতে ঘুরতে, 'বিন্দু বিন্দু জীবনযাপন' করতে করতে, খান্না সিনেমার উল্টোদিকে পতিতাপল্লীতে অন্য এক 'বন্য মুঠোয় ডাগর সাহস' দেখাচ্ছিল। আমার ছোটবেলায় দেখা এবং ছোঁয়া সেই পদ্মের সঙ্গে কীভাবে যে মিশে যেত, যায়, বেলগাছিয়া মাঠের নীল ভ্রূণের ছবি আর শঙ্খ ঘোষের কবিতা, আমি কী করে বলব ?

এক ম্লান এবং সুন্দর দুর্গাপুজোর ছবি মনে পড়ে দেশের কথা ভাবলে। উত্তর কলকাতায় এমন দেখিনি। ঢাক আর খঞ্জনির ক্ষণস্থায়ী মিলনের কমার্শিয়াল ব্রেকের পরেই চলে আসত 'চুরা লিয়া হ্যয় তুমনে যো দিলকো'। পরে দেখেছি দক্ষিণ কলকাতায় সেই একই ছবি। একমাত্র অবন মহলের পাশে এক পুজো হত যেখানে শুধুই বাংলা গান বাজত। এমন নয় যে আমি হিন্দি গান বাজানোর প্রতিবাদী। কিন্তু 'ইয়াদোঁ কি বারাত'-এর মতো শৈশব মোহমুগ্ধকর সিনেমার চটুল গানের পাশে তখনও স্থলপদ্মের ছবি কেমন যেন ধাক্কা দিয়ে যেত মজ্জায়। অথচ ওই চটুল গানেরও ভক্ত ছিলাম আমি। ওই গানের প্রেলিউড যখন ভেসে উঠত গিটারের ছররায়, তখনই রেফিউজি জীবন এবং খেলাৎবাবু লেনের ম্লানতায় প্রতিবাদ করে উঠত মন, অনেক সহনীয় মনে হত 'দুর্বিষহ মাতালের প্রলাপের মতো' ওই গলিটা। অথচ পুজোর ওই সব দিনগুলোয়, মনে রাখবেন বন্ধুগণ, তখনও কলকাতায় ঋতু বদলাত

দৃশ্যমান, আমি শুনতে চাইতাম বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গলায় মহালয়া। এসব কথা থেকে আমি কিছু প্রমাণ করতে চাইছি না। শুধু বলছি আমার নিজের কী ভাল লাগত। ভাল লাগত যখন দুপুরে নি:শব্দ প্যান্ডালের থেকে ভেসে আসত হেমন্তের গলায়, 'তুমি চলে গেলে'। পুজোর উদ্যোক্তারা তখন ঘুমোচ্ছে বাড়িতে এক ঝিংকুচিকু সন্ধের মোহে। এক অদ্ভুত বাংলা শভিনিজমে কেন যে আবদ্ধ ছিলাম তখন, এবং আজও আছি, তার কোনও কারণ আমি দেখাতে পারব না। সব ওই পদ্মের দোষ।

সব ওই ফুলের দোষ। সব দায় ওই পাকিস্তানি শরতের। কবে যেন একদিন হঠাৎ বুঝতে পারলাম দুর্গাপুজো আমায় আর টানছে না। কোনও মোহ নেই আমার মনে ওই ঝকঝকে রোদের জন্য। ওই দূর থেকে ভেসে আসা ড্যামকুরকুর ট্যাংট্যাং-এর প্রতি। আমার বয়েস তখন বত্রিশ।

ততদিনে আমার শরৎকাল, আমার দুগ্গাপুজো, আমাকে এক বিচ্ছিন্ন নাগরিক বানিয়ে দিয়েছে। তবে সেসব এই কাহিনীর আওতায় পড়ে না।

পর্ব ১০

বাবু, গুরুপদ, টুটুল, খোকন -- এরা ছিল খেলাৎবাবু লেনের বন্ধু। আমাদের আশপাশেই থাকত। বাঙাল ইত্যাদি আওয়াজ দিলেও তার বেশি বিরক্ত করত না। বাবু হিন্দুতে আর টুটুল স্কটিশ-এ পড়ত। ওদের পারিবারিক ধরনে একটা মধ্যবিত্ত শিক্ষা-সংস্কৃতির ছাপ ছিল। নিয়ন্ত্রণ ছিল। সেসব ছিল না শুধু গুরুপদ আর আমার। গুরুপদ নিশ্চয় আমারও মতো কোনও স্কুলে পড়ত। মাঝে মাঝে যেতে দেখতাম সেই স্কুলে। তখনও একই ক্লাসে স্থায়ী বসে থাকা ছাত্রদের বেশ চারদিকে দেখা যেত। টুটুল, বাবু, প্রবালরা সন্ধেয় খেলা শেষ করে চলে যেত বাড়ি। কোনও না কোনও রকে বসে থাকতম আমি আর গুরু। বড়িতে গিয়ে রোজই মার খাওয়ায় অভ্যস্ত ছিল গুরুপদ। বিশাল পরিবারের কোনও না কোনও সদস্য প্রতিদিনই কোনও সঙ্গত কারণ পেতেন ওকে মারার। ওই ব্যাপারটা দার্শনিকভাবে নিয়েছিল সে। প্রতি রাত্রেই ওর চিৎকার শুনে বুঝতাম ওকে মারা হচ্ছে, ওর লাগছে না, নেহাতই রেফারির মতো হুইসল বাজাচ্ছে। প্রথম দিকে দু-একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম আর্তনাদের কারণ। ও নিভাঁজ মুখে বলত, ওই, দাদা মারছিল সালা। উত্তর কলকাতায় 'সালা' গালাগালির মধ্যে পড়ত না। বরং 'শালা' বললে কেউ দু:খ পেতে পারত। এর কারণ সম্ভবত হিন্দি সিনেমা।

আমি বাড়ি ফিরতাম না ফিরতে ইচ্ছে করত না বলেই। যাকে ভয় পেতাম সেই ছোড়দা

তখন তার বড়লোক বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারছে কোথাও। বিবর্ণ এক বাড়িতে মা শুধু ঘ্যানঘেনে গলায় বলত পড়তে বসতে। আকণ্ঠ গল্পের বই পড়তাম, কিন্তু পড়ার বই একদম না। মনোহর একাডেমির অন্যান্য অনেক ছেলেমেয়েদের মতো টেনেটুনে ঘসে-মেজে উতরে গেলাম ফোর থেকে ফাইভ। ততদিনে আমি গভীরভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছি। মাঝে মাঝেই ফুড়ুক করে বিড়ি সিগারেট টানছি। এর হাতেখড়ি অবশ্য আরও শৈশবে পূর্ব পাকিস্তানে। পানার সঙ্গে ঝোপের ধারে গিয়ে বিড়ি টানার সময় হতকুচ্ছিত লেগেছিল ওই জিনিসটাকে। বমি পেয়েছিল, কাশতে কাশতে লাট। বাড়িতে এসে ধরা পড়ি পিসির কাছে। সুধীরদার মা হুশহাশ কয়েকটা বকুনি দিয়ে ব্যাপারটা চেপে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ধরে ফেলল ছোড়দি, ফটাফট থাপ্পড়। মার কাছে নালিশ। কানমলা। এ জাতীয় শিশুশিক্ষার পরেও দু-একবার খেয়েছিলাম নিষিদ্ধের আনন্দে। পরে চট করে পেয়ারাপাতা চিবিয়ে নিতাম। এবং ধরা পড়তাম এবং আবার সেই ফটাফট থাপ্পড় আবার কানমলা। বাবার কাছে এ-খবর যেত না।

খেলাৎবাবু লেনে থাকতে আবার সেই নিষিদ্ধের প্রেমে পড়ে যাই। এবার সিগারেট-বিড়ির এক কদম আগে। বড়দের, পুরুষদের কথার জগৎ। খিস্তি, অশ্লীল ইঙ্গিত, কুপ্রস্তাব, চেনা মহিলাদের নিয়ে গা-গদগদে ঠাট্টা, ওঃ কী ভালই না লাগত। ওরা লক্ষ করত না যে সন্ধের রক-এর এক ধারে এক বালক একলব্যের মতো রপ্ত করছে পুরুষের পদাবলী। এমন নয় যে ওখানে ভাল সঙ্গী ছিল না। টুটুলদের বাড়ির কেউ ওভাবে রক-এ আড্ডাও মারত না, ওরকম গল্পও করত না প্রকাশ্যে। দশ বছর বয়েসে আমার ভোকাবিউলারি ছিল ঈর্ষণীয়। ছায়া-ছায়া এক যৌনতাকে চিনতে পারছিলাম কিন্তু তার ধারণ বা ব্যবহার ক্ষমতা আয়ত্তে আসেনি। বিভিন্ন রক আলোকিত করে বসে থাকত বিভিন্ন বয়েসের পুরুষ। বড়রা ছিল অফিস থেকে ফিরে বাড়ফট্টাই-এর রাজা। বখে যাওয়া কিশোর এবং যুবকেরা ছিল অন্য রকে। প্রধান আলোচ্য বিষয় হিন্দি সিনেমা (এবং বাংলাও, তখন বাংলা সিনেমা নিয়েও বিভিন্ন বয়েসিদের মধ্যে আলোচনা হত), ফুটবল, ক্রিকেট, নারী, নেশাভাঙ। অপ্রতিরোধ্য বিষয়, আশ্চর্য সব তথ্য, রোমাঞ্চকর প্রতিবেদন। আমি গিলতাম সব। এর মধ্যে 'গুরু' রব বাড়ি থেকে ভেসে এলেই গুরুপদ হাওয়া। একা ফিরতাম আরও পরে। ছোড়দার হাঁটা দূর থেকে দেখলেই আমার দৌড় শুরু। বাড়িতে ঢুকে যা-ইচ্ছে বই টেনে নেওয়া। এক গম্ভীর বাতাবরণে বিরাজ করত আমার ষোল বছরের ছোড়দা। রাজা মনীন্দ্র স্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্র। আমার দণ্ডদাতা সেই কঠোর কিশোরের উপর ছিল কার্যত এই উদ্বাস্তু পরিবারের জীবন নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব। বাইরের সব কাজ করতে হত তাকে। মাঝেমধ্যে কোনও কারণে অলককাকুর সঙ্গে সে থিয়েটর রোডের পাসপোর্ট দপ্তরে কেন যেন যাতায়াত করত। আমার খুব ইচ্ছে করত ওরকম দায়িত্বশীল কোনও কাজ করতে। দু-নম্বর বাস স্টপের পাশে একবার দেখেছিলাম অলককাকু আর ছোড়দা চলন্ত অবস্থায় অল্প দৌড়ে উঠে গেল একটা একতলা সরকারি বাসে। আমার মন আনচান করেছিল ওদের যাত্রার সঙ্গী হওয়ার জন্য। কিন্তু

দূর থেকে গোপনে ওদের লক্ষ করা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না আমার। ছোট হওয়ার তাড়না সহ্য করেছি পুবদেশেও। আঙ্গারিয়া বাজারে যাওয়ার পথে একটা কীসের যেন গুদাম ছিল, যেটা কিছুদিন সিনেমা হল হয়েছিল। তানসেন নামের একটা সিনেমা ওখানে দেখেছিলাম। নায়ক-নায়িকা ছিলেন আজিম আর কবরী (খুব সম্ভব)। সদ্য বিয়ে হওয়া জামাইবাবু আর ছোড়দা সেই সিনেমাটা দেখতে গিয়েছিল। আমার কাকুতি-মিনতি অগ্রাহ্য করে, আমাকে সঙ্গে না নিয়ে রঙিলা জামাইবাবুর সঙ্গে বিকেল বেলা ওদের বেরিয়ে যাওয়ার বুকে গরম শিক ঢুকে গিয়েছিল। সেদিন দান্দার ঘরে ঢুকে, বিছানার চাদর সরিয়ে আমি খুচরোয় প্রায় এক টাকা চুরি করেছিলাম। তারপর শীতের সেই পড়ন্ত বিকেলে ছুটে গিয়েছিলাম ওই গুদাম, থুড়ি, সিনেমা হলে। সামনে পাটি পাতা মাটিতে বসেছিলাম আমি, ওরা বসেছিল কিছু পেছনের চেয়ারে। খুব হাসছিল ওরা আর কী যেন খাচ্ছিল। আমাকে লক্ষই করেনি। আমার তীব্র অভিমানী মন চাইছিল ওরা আমাকে দেখুক ওই পাটি-পাতা হেনস্থার মধ্যে। জামাইবাবুর মন বর্ষার পাটখেতের মতো নরম হয়ে উঠুক। সে এগিয়ে এসে আমাকে চেয়ারে গিয়ে বসার জন্য বার বার অনুনয় করুক। আমি কিন্তু যাব না। ছোড়দার চোখ ছল-ছল করুক আমার প্রতি অন্যায়ের কথা ভেবে। আমি যাব না তবুও। কিন্তু সেসব কিছুই ঘটেনি। ওরা দেখছিলই না যে আমি কোথাও ছিলাম। এর ফলে আমি সিনেমার বেশ কিছুটা অংশ দেখতে পাইনি।

ছোট থাকার এই যন্ত্রণা সারা জীবন তাড়া করে ফিরেছে আমায়। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে মা যখন মরে গেল, তখন আমার প্রথম মনে হল, আমি বেশ বড় হয়ে গেছি। কিন্তু সেই বড় হওয়াও খুব বেদনার। যেমন প্রথম যখন অনুভব করি যে আমার কান্নায় কেউ বিচলিত হচ্ছে না, বরং রেগে যাচ্ছে, তখন আমার বয়েস পাঁচ-ছ হবে। কোনও একটা কারণে কাঁদতে গিয়ে আমার খেয়াল হয় যে কেউ ফিরে তাকাচ্ছে না আমার দিকে। এমনকি মা-ও না। এক বিপন্ন বিস্ময়ে কান্না বন্ধ করে আমি বুঝতে পারি এরই নাম বড় হওয়া। সেদিন থেকেই সম্ভবত আমার চোখের জলের দাম কমে গেল। বড়রা এই দিনটা কবে থেকে ঠিক করে আমি জানি না। সন্তানের ঠিক কোনও বয়েসে তারা সিদ্ধান্ত নেয় ব্যস, ঢের হয়েছে, ছেলে-মেয়ে বড় হয়েছে, এখন আর মন ভোলানো কান্নার ফাঁদে পড়ব না আমরা। আমার ছেলের বয়েস হতে চলল দশ। এখনও আমরা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে পারিনি। তার কান্নাকে অগ্রাহ্য করতে কোনও পদক্ষেপ নিতে পারিনি।

এই দিন দিন নষ্ট হয়ে যাওয়ার হাত থেকে, হেজে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল বই। বই পড়তে ভাল লাগত তখনও। শীতের শেষে অ্যানুয়াল পরীক্ষার পরের দিনগুলো ছিল বহি-প্রতীক্ষিত, pun করার লোভ সামলাতে পারলাম না। আমাদের বাড়ি থেকে একটু হেঁটে গেলেই ডান হাতে ছিল হিমানি কোম্পানির মালিকের বাড়ি। সেই বিশাল বাড়িতে একটা লাইব্রেরি ছিল, উত্তরায়ণ নামে। তার কিশোর বিভাগের

সমস্ত বই আমার পড়া হয়ে গিয়েছিল। লুকিয়ে-চুরিয়ে সাধারণ বিভাগের দিকেও হাত বাড়াতাম। এই কারণে পরে ওই লাইব্রেরিতে কিশোর বিভাগের বই দেবার মহান সম্মান পেয়েছিলাম। গা থরথর করত আনন্দে যখন বই ইস্যু করতাম, নিজের চেয়ারে বসে যখন ঠান্ডা মুখে বলে দিতে পারতাম কোথায় কোন বই আছে। লাইব্রেরিটা মূলত চালাত প্রবীরদা আর বাবুদা। দুজনেই বোধহয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম এ করছে তখন। হিমানি বাড়িতে একটা সিনেমাও দেখেছিলাম, প্রজেক্টর লাগিয়ে দেখানো হয়েছিল। সলিল দত্তের স্ত্রী। সেখানে একটা জায়গায় হাতে বন্দুক নিয়ে উত্তমকুমার আরতি ভট্টাচার্যকে একটা ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন, এই বাচ্চার বাপ কে ? বলো ! আবার বিষয়টা আমার মনের ধন্দের সৃষ্টি করে এবং মাকে প্রশ্ন করি রাতে। থাপ্পড় না মারলেও মা এক দাঁত খিটখিটে উত্তর দেয়, যা থাপ্পড়েরই মতো। অথচ তখন অপরিণত যৌনতা নিয়ে আমি একটা বই লিখতে পারি।

অদ্ভুত শীত নামত উত্তর কলকাতায়। তখনও স্পষ্ট বোঝা যেত শীতের হিম নেমে আসছে সন্ধের দিকে। পাকিস্তানি শীতের মতো নয়। সেই এক অপূর্ব হি-হি শীত, মাঝে-মধ্যে উঠোনে লতাপাতা জ্বালিয়ে গ্রাম্য বনফায়ার। এমন কি ভর দুপুরের পুকুরে নেমে কাঁপতে কাঁপতে একে অন্যকে জল ছেটানোর শীত নয় সে। উত্তর কলকাতায় ৭১-৭৫-এর শীত নামত হালকা পেট্রলের গন্ধ নিয়ে, খুব হালকা সেই গন্ধ, যেন নেশা ধরিয়ে নেবে। বেশ কিছু গাছপালা ছিল তখনও আশেপাশে। বিশেষ করে মনে আছে টালা পার্ক অ্যাভিনিউতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বাড়ির উল্টোদিকে তথাকথিত এক লেডিজ পার্ক-এ সকালে গিয়ে বসে থাকার কথা। সেখানে ছিল একটা মহুয়া গাছ। শীতে সে এক ধরনের কষ্টা ফল নিয়ে ঝুপড়ি সেজে বসে থাকত। আমার মনে হত গাছটা সাঁওতাল পরগনার স্বপ্ন দেখছে। বিমল করের ঘোর-লাগানো গল্প পড়তে শুরু করেছি তখন। খুব খেতাম ওই মহুয়ার ফল। কে যেন বলেছিল, খেলে নেশা হবে। আমার সেসব কিছু হয়নি। আমি খুব বড় মাপের নেশারু হওয়ার জন্য জন্মেছিলাম।

তখনও এক ঋতুর সঙ্গে অন্য ঋতুকে মিলিয়ে চলেছি। এক বর্ষার সঙ্গে অন্য বর্ষাকে, এক শীতের সঙ্গে অন্য শীতকে। সম্ভবত বসন্ত চেনার মন তখনও তৈরি হয়নি। প্রথম বসন্ত আসে কিছুদিন পর। রেফিউজি লাইন পাঁচ টালা পার্ক অ্যাভিনিউ।

পর্ব ১১

রণজিৎ চ্যাটার্জি, আমার জামাইবাবু এবং আমাদের সপ্নো কা সওদাগরকে বাড়ির অনেকেরই পছন্দ হয়নি হবু জামাই হিসেবে। তালুইমশাই দান্দার পরিচিত ছিলেন এবং তার পেছু পেছু তাঁর পুত্র একবার আসে আমাদের বাড়িতে। বড়দি বেশ ভাল দেখতে ছিল, সেই খবর তার কানে পৌঁছে থাকতে পারে। টেরিলিনের জামা এবং ডান হাতে ঘড়ি পরা গোপালগঞ্জ টাউন নিবাসী রঙিলাকে নিজের শ্রীরূপ দেখাতে বড়দিও উদ্যোগ নিয়ে থাকতে পারে। আবার আসে জামাইবাবু। এবার আমাদের নিয়ে হুল্লোড় করতে। মহিলারা দাঁত-কেলানে খরচে লোক পছন্দ করে যদি সে স্বামী না হয়। জামাইবাবুর প্রতি মার তাই বিরূপ মনোভাব থাকার কথা নয়। বাবা যে ঠিক কী ভেবেছিল জানি না। বড়দার তীব্র অপছন্দ ছিল ভদ্রলোককে। কারণ জামাইবাবু আকাট অশিক্ষিত ছিল। দান্দাও পছন্দ করেনি ব্যাপারটা। আমার পরে মনে হয় যে পুরোনো আমলে এ বিয়ে হতে পারত না। আমাদের সেই সময়ের অবস্থাই বোধহয় বিবেচনা করেছিল পরিবার। এসব পরে আমায় বলে ছোড়দা।

বিয়ের দিন বাড়িতে নহবৎ বসেছিল। কিন্তু পোঁ-পাঁ বাদকেরা পছন্দের গান বাজাচ্ছিল না। নীল আকাশের নীচে আমি রাস্তা চলেছি একা গান বাজানোর একান্ত অনুরোধ মিষ্টি করে প্রত্যাখান করে প্রধান বাদক। 'বাজামু অহন' বলে আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নেয় সে। বাবা তখন কোথায় যাচ্ছিল ব্যস্ত হয়ে। আমি বাবাকে আমার অনুরোধ জানাই। দু'হাত তুলে বাবা নির্দেশ দেয়, বাজাও নীল আকাশ। এই বলে কোথায় যেন চলে যায় আমার বাবা। পেছন থেকে পোঁ-পাঁ শুরু হয়। আমি দেখি বাবাকে কোনও একদিকে চলে যেতে। কোনও কারণ নেই হয়তো, তবু এই ছবিটা মনে রয়ে গেছে। মনে রয়ে গেছে বাবার দু-হাত তুলে বলা, বাজাও নীল আকাশ। কোথায় গিয়েচিল বাবা ? টাকার জোগাড় করতে ? কীভাবে ? অমন সুন্দর ভঙ্গিতে বাবা কেন বলেছিল কথাগুলো ?

কোনও কোনও দিন মনে আছে বাড়িতে খুব আনন্দ হত, অন্য রকমের আনন্দ। সেদিন বাবার ঘরে তাস খেলতাম আমরা। বাবা-মা-ছোড়দা এবং আমি। সেই ছোটবেলায় টোয়েন্টি নাইন খেলতে শিখেছিলাম, তারপর ব্রে। শুনেছি অনেক বাড়িতে শিশুদের তাস খেলা নিষেধ ছিল। আজ মনে হয়, আমরা অনেক উদার পরিবেশে বড় হয়েছিলাম। শুধু টাকাটাই ছিল না আমাদের। সম্ভবত যেদিন বাড়িতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি টাকা আসত, সেদিন ওই সব আনন্দ হত। প্রথম যৌবনে আমার ইচ্ছে করত এক বড়লোক বাবার কথা ভাবতে। দৃশ্যগুলো সঙ্গে সঙ্গেই বদলে যেত। অনেক আনন্দঘন সরোদ বেজে উঠত মেঘমল্লারে। এক ধনী গ্রাম্য বাড়ির ছোট ছেলে চলেছে কলকাতার শ্রেষ্ঠ স্কুলে পড়বে বলে। মার বুকে মাথা রেখে অনেক কেঁদে শেষে সে,

মানে আমি, এক আশ্চর্য যাত্রায় চলেছি বাবার সঙ্গে। কলকাতায়। গোয়ালন্দ ঘাট থেকে ফেরি, ওপারে সেই স্মৃতিমেদুর পেট্রলের গন্ধ, বেনাপোল, পেট্রাপোল পেরিয়ে এক রাত পেরিয়ে বনগাঁ। ইন্ডিয়া বিপুল হেসে বুকে জড়িয়ে ধরছে আমাকে। কলকাতার স্কুলে ভর্তি হচ্ছি। বিখ্যাত স্কুল। নাম শুনলেই কয়েক বছর পরে গা ছমছম করে উঠবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি পড়তে আসা আমার সহপাঠীদের। এরপর সবাই আসছে। সবচেয়ে আগে আসছে মা। আমাদের কলকাতার বড়লোকি বাড়িতে শোল-মুলো রান্না করে, খাইয়ে, স্কুলে পাঠাচ্ছে আমাকে। শীতের রোববার দুপুরে বাড়ির বারান্দায় বসে প্রবাল আর তার বাবা-মা-র মতো আমিও কমলালেবুর খোসা ছাড়িয়ে খাচ্ছি। উত্তর কলকাতার হলদে পড়ন্ত রোদ গায়ে মেখে এমনকি ছোড়দাও আছে আমাদের সঙ্গে। ও আমাকে দল না টানলেও আমি কিন্তু নির্দ্বিধায় ওর দিকে এগিয়ে দিচ্ছি কমলালেবু, যাকে ঘটিরা শুধু লেবু বলে। বা শুধু কমলা বলে। সেই স্বপ্নের জীবন শীতের দুপুরে নিয়মিত দেখতে পেতাম খেলাৎবাবু লেনে আমাদের উল্টোদিকের বাড়ির দোতলা বারান্দায়। প্রবাল ওর বাবা-মার সঙ্গে বসে কমলালেবু খাচ্ছে আর গল্প করছে। প্রবাল আমাদের ক্রিকেট খেলার সঙ্গী ছিল, আর কিছুর নয়। ওর বাকি জীবনটা ছিল স্বপ্নময়। ক্যালকাটা বয়েজে পড়ত। ওর বাবা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ওদের কালো রঙের ল্যান্ডমাস্টার চালিয়ে কখনও স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন শনি-রবিবার বিকেলে। সেদিন প্রবাল খেলতে আসত না, আমরা খেলে ঘেমো ভূত হয়ে বাড়ি ফেরার পথে খিস্তিখাস্তা করতে করতে হঠাৎ দেখতাম সেই গাড়ি। ওরা বেরিয়ে যাচ্ছে আমাদের ফেলে-আসা পথে। প্রবালকে ঘিরে রেখেছে ওর প্রসন্ন বাবা আর সুন্দরী মার আদরের ওম। এই মহৎ দৃশ্য আমাদের সংযত হতে বাধ্য করত। মুহূর্তে আমরা সোল্লাসে হাত নাড়তাম ওদের দিকে। প্রবাল হাত নাড়ত। ওর মা অন্যমনস্ক স্নেহের হাসি হাসতেন। অন্যদের মনে কী ঘটত জানি না। আমি মুহূর্তে ওয়াটার মিটির মতো উচ্চ বুর্জোয়া স্বপ্নে হারিয়ে যেতাম। আমার বড়লোক বাবা-মার সঙ্গে সান্ধ্য ভ্রমণে জড়িয়ে নিতাম ছোড়দাকেও।

কমলালেবু প্রসঙ্গে মনে পড়ে যে আমাদের দেশে, অন্ততপক্ষে আমাদের গ্রামে, ওই ফল চোখে দেখিনি কোনওদিন। গল্প জানতাম অনেক। দার্জিলিং-এ যে ফলে ওই ক্লাস থ্রির ছবির বইয়ে দেখা ফল, তা জানতাম। একদিন বাড়িতে শোরগোল। জানা গেল পুকুরপাড়ে একটা নতুন ধরনের লেবুগাছ চোখে পড়েছে মেজদাদুর। এ ধরনের গাছ আগে দেখেনি কেউ। থরথরে রোমাঞ্চ নিয়ে পুকুরপাড়ে হাজির গোটা বাড়ি। পেট-ভর্তি দীঘির চালের ফেনাভাত, ঘি আর আলুসেদ্ধ খেয়ে টনটনে পেট নিয়ে তরুণ বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমরা, প্রধান বৈজ্ঞানিক মেজদাদু এবং হীরালাল শীল, আমাদের আশ্রিত পরামাণিক, হরেকেষ্ট এবং প্রাণকেষ্টর বাবা, প্রধান তাত্ত্বিক -- এই পর্যবেক্ষক সমিতি লেবু গাছটিকে পরীক্ষা করে একবাক্যে ঘোষণা করে এ গাছ কমলালেবুরই। এখন যা কষা টাইপের শক্ত ফল তা অচিরেই কমলা রঙ নেবে। এই বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তের পর আমরা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করি। ছোট শক্ত লেবু ক্রমে বড় হয়,

নরম হয় এবং সবুজই থাকে। পরে কোনও মাতব্বার জানান, এই লেবুর নাম জামির। ব্যাপারটা অনেকটা এদেশি মুসাম্বির মতো। আমি আজও জানি না, জামির মুসাম্বিরই উর্দু বা বাঙাল নাম কিনা।

আর কলকাতার রাস্তাঘাটে ছড়ানো কমলালেবু। এক মুহূর্তেই মোহভঙ্গ আমার। এত সহজ। দার্জিলিং-এর মিষ্টি লেবু লাট খায় কলকাতার বাজারে। এত সস্তায় কিনে নেওয়া যায় তাকে। আর এক রকমের বিন্দু বিন্দু জীবনযাপন এই লেবুরও। এভাবে ধীরে ধীরে ভোগবাদী এক শহুরে দুনিয়ায় ঢুকে পড়ে রেফিউজি মন আর জীবন। এভাবেই আঙুর, যা কিনা লোভনীয় ভাবে উপস্থিত ওমর খৈয়াম-এর জমজমাট ছবির পাতায়, বিক্রি হয়ে যায়। আর আমরা স্বাভাবিক হতে থাকি।

প্রবাল আমার পরম বেদনার স্মৃতি। আমি ওই রকমই একটা স্বাদু বুর্জোয়া জীবন চেয়েছিলাম। আমি ঠিক ওই রকম একটা ছোটবেলা চেয়েছিলাম। বোধহয় তা না পাওয়ায় আমি আরও বখে যেতে থাকি। প্রথম কৈশোরে একটা সময়ে ছেলেদের শরীর গঠন করার দিকে মন যায়। ছোড়দারও সে-রকম একটা সময় এসেছিল। একদিন টালা পার্কে ব্যায়াম ফেরত ছোড়দাকে দেখি আঙুর খেতে খেতে ফিরছে। বোঝা গেল, ওই আঙুর ও একা খেয়েই বাড়ি ফিরবে ভেবেছিল। মুখোমুখি হওয়ায় দাদা কয়েকটা আঙুর আমকে দেয়। তারপর মৃদুমন্থর গতিতে বাড়ির দিকে চলে যায়। আমি উলটোদিকে কুট্টিদাদুর বাড়ির দিকে যেতে গিয়ে ওর চলে যাওয়া দেখি। যে কোনও তরুণ ব্যায়ামবীরের মতো শরীরের ভেতরের মাসলের ওঠাপড়া বুঝতে বুঝতে বাজার সেরে বাড়ি ফিরছে ছোড়দা। তখনও আঙুর খাচ্ছে সে।

আমি চলে যাই মোহনের দিকে। মোহন মাহাতো। নতুনপাড়ার রেল বস্তির বাসিন্দা। শক্ত শরীর, কুচকুচে কালো রঙ। সম্ভবত কয়লায় দাঁত মাজত বলে তার মুখে একটা আঁশটে গন্ধ পাওয়া যেত সকাল বেলা। ওই সময়েই আমরা মিলিত হতাম টালা ব্রিজের ওপর। তার সঙ্গেই জীবনে প্রথম লরির পেছনে টায়ারে পা রেখে নিখরচায় যাতায়াত রপ্ত করা। সেভাবেই একদিন ভোররাতে রক্সি বা জ্যোতি সিনেমা হল-এ শোলে দেখা। মোহন আমাকে প্রথম শেখায় কীভাবে নড়বড়ে ট্রামের দুই কামরার মাঝখানে পা রেখে যাতায়াত করা যায়। চেকার কোনও স্টপে নেমে তাড়া করলে দৌড়। ওই উত্তেজনায় ভরা জীবন আজ আর দেখা যায় না। লরি বা বাসের পেছনের টায়ারে বসে যাত্রারত মোহন আর আমাকে আমি দেখি না আজ কোথাও।

বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ থেকে গিয়েছিল বড়দি এবং ছাতাওয়ালাদের মাধ্যমে। একটু উলটে-পালটে নিলে এই বাক্য হয়ে উঠতে পারতো ৭-র দশকের বাংলা কবিতার লাইন। কিন্তু বাস্তবত এর মধ্যে একটি গদ্যগোছের সাদা গল্প আছে। দেশে ফিরে কোনও কারণে বড়দি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল যে একদিন ওই দেশ ছাড়তে

হবে। আমাদের গোটা পরিবার যা কোনওদিন করেনি, দিদি সেই দূরদর্শীতার পরিচয় দিতে আরম্ভ করল টাকা পাঠিয়ে। ভবিষ্যতে কখনও যদি ইন্ডিয়ায় আসতে হয়, তখন টাকা দরকার হবে। কীভাবে ও টাকা জোগাড় করত জানি না, কিন্তু মাঝে-মধ্যেই দু-পাঁচশ টাকা পাঠাত আমাদের। নর্দার্ন এভিনিউর কোনও একটা ব্যাঙ্কে তার নামে অ্যাকাউন্ট খোলা ছিল। কথা ছিল, ছোড়দা টাকা জমা দেবে সেই অ্যাকাউন্টে। কিন্তু ভিনদেশ থেকে কীভাবে আসবে টাকা ? বাংলাদেশি টাকাকে ইন্ডিয়ান টাকায় পরিণত করে কে পৌঁছে দেবে সেই টাকা আমাদের কাছে ? কেন, ছাতাওয়ালা ? প্রধানত মুসলিম এই সব ছাতাওয়ালারা বাংলাদেশ থেকে অহরহ ভারতে আসত। কলকাতায় এসে উঠত বেলগাছিয়া বস্তিতে। পাড়ার রাস্তা দিয়ে 'ছাতা সারাই' ডাক দিয়ে যেতে যেতে তাদেরই মধ্যে কেউ থমকে দাঁড়াত আমাদের বাড়ির সামনে। একটু গোপনে রফা হত তাদের সঙ্গে। তারা আমাদের বড়দির চিঠি দিত আর দিত টাকা, ভারতীয় টাকা, বড়দির ওদেশে দেওয়া বাংলাদেশী টাকার বদলে। আমরা আবার তাদের হাতে তুলে দিতাম মার লেখা চিঠি। চিঠির শেষ লেখা থাকত 'ইতি আং মা'। আমিও পরে একটা চিঠি পাঠাই 'ইতি আং কুট্টি' লিখে। সেই নিয়ে হাসাহাসি হয়। 'আং' মানে যে 'আশীর্বাদিকা' তা কিছুটা বিড়ম্বনার মধ্যে দিয়ে জানতে পারি।

একবার হঠাৎ এল না চেনা ছাতাওলারা। বেশ কিছু দিন এল না। যারা আসছে, তারা টাকার ব্যাপারে কিছু জানে না। ওদিকে দিদির চিঠি এসে গেছে। ও টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। অতএব আমাকে এক দিন যেতে হল বেলগাছিয়া বস্তিতে। মুস্তাফা নমের এক ছাতাওলার খোঁজে।

পর্ব ১২

বেলগাছিয়া বস্তি তখন ভীষণ নোংরা একটা এঁদো গলি। গলি মানে অনেক গলি। সেখানে গেলাম মুস্তাফাকে খুঁজতে। এ অনেকটা টিনটিনের হংকং-এ গিয়ে চ্যাং-কে খোঁজার মতো। প্রায় প্রত্যেকটা বাড়িতেই একটা করে মুস্তাফা আছে। তাদের মধ্যে সত্তর শতাংশই ছাতাওয়ালা। আমি এ কথাও জোর দিয়ে বলতে পারি যে তারা প্রায় সবাই এক রকম দেখতে। আমি ধন্দে পড়ে গেলাম। কাঁদা বাকি শুধু। ওই অল্প সময়ে ওদের সঙ্গে আলোচনা করেই আমার মনে হল এদের সব জীবিকাই এক। অর্থাৎ সব মুস্তাফাই ছাতা সারায়, টাকা পাচার করে, তখনও সদ্যমুক্ত রাষ্ট্রের খোলা সীমান্ত পার করিয়ে দেয়, এধার থেকে ওধার থেকে এধার পাচার করে মানুষকে। এই করে সেই গোবিন্দের মতো এই মুস্তাফারা কিছু কামিয়ে নেয় আলুথালু বাজারে। তবে এত গোবিন্দ একসঙ্গে আগে দেখিনি কখনও।

শেষ পর্যন্ত আসল মুস্তাফা এল। গালি গায়ে লুঙ্গির খুঁট থেকে টাকা বের করল। একবার গোনার ভান করল। তারপর আমায় দিল কিছু নোংরা নোট। কত আছে গোনার সাহস ছিল না আমার। আশপাশের লোকেদের সবার চোখ স্থির টাকার দিকে। আমি হাফ প্যান্টের পকেটে টাকা ঢুকিয়ে দে-দৌড়। পেছন ফিরে তাকাতে তাকাতে, মেন রাস্তার যানযট ভুলে কোনও মতে বেলগাছিয়া মাঠ। সেখানে এসেই নিশ্চিন্ত। চেনা চেনা মুখ চারদিকে। ওই দিকে পরে আর যাইনি কখনও। তখন বেলগাছিয়া বাজার থেকে ফেরার সোজা পথ ছিল ওটা, মাঠের মধ্যে দিয়ে। মাঠটা শেষ হত একটা ত্রিকোণ রাস্তায়। বাঁ-দিকে গেলে টালা পার্ক এভিনিউ, ডান দিকে গেলে অনাথ দেব লেন, সোজা গিয়ে একতু বাঁয়ে খেলাৎবাবু লেন। তখন আমি ছুটছি না, দ্রুত হাঁটছি। বাড়িতে টাকা পৌঁছতে হবে।

গুনে দেখা গেল টাকা কম। দিদির চিঠিতে লেখা সংখ্যার সঙ্গে মিলছে না। মার মাথায় হাত। ছোড়দা বাড়িতে ফিরে খবরটা শুনে মনে মনে হয়তো আমাকে সন্দেহ করল। তখন বছর এগারো বয়েসেই আমি সন্দেহজনক হয়ে উঠছিলাম। আজ আর পুরো দোষ নিজেকে দিতে পারি না। একটা পয়সাও কেউ দিত না হাতে, অথচ চারদিকে নানান পণ্য জড়িয়ে রয়েছে। খেলনা রিভলভার, কাঠি আইসক্রিম, ক্যাডবেরির চকলেট, জেম্‌স, গল্পের বই। লোভে চোখ জুলজুল করত। এমনকি গুরুপদকেও মাঝে-মধ্যে চকলেট খেতে দেখেছি। আমায় একটা জিনিস কিনেও দিত না কেউ। না উপহার পেতাম, না টাকা। বড়দা এলে কিছু কিনে খাওয়াত, মার কাছ থেকে কখনও দশ পয়সা পেলে স্কুলে হজমি বা আলুকাবলি খাওয়া যেত। কিন্তু তার বেশি কিছু না। অনেক দিন আমি স্বপ্ন দেখেছি কড়কড়ে পাঁচ টাকার নোট এগিয়ে দিচ্ছি শ্যামদার দোকানে। একটা মিল্ক চকলেট একা খাচ্ছি। বই কিনছি সত্তর পয়সা দিয়ে স্বপনকুমারের কালনাগিনীর অভিশাপ। স্বপ্ন পূরণের জন্য চুরি খুব অন্যায় কিছু নয়। তবু ওই একই কারণে আমার বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল না।

তবে সত্যের একটা বাড়তি জোর থাকে। সেটা নিশ্চয়ই আমার মুখে-চোখে ফুটে উঠেছিল। তাই আমায় কিছু বলা হল না। ওই বয়েসে বেলগাছিয়ার নোংরা বস্তিতে যে ভয় এবং ঘেন্নার মধ্যে ঘুরে আমি টাকাটা জোগাড় করেছি তা যে এক নায়কোচিত কাজ। আমার পিঠ চাপড়ে দেওয়া উচিত, তারিফ করা উচিত আমার সাহসের। কিন্তু সারা জীবন কোনও কাজের জন্যই পরিবার থেকে কোনও স্বীকৃতি পাইনি। অনেক সময় এমন হয় যে দারিদ্রের কারণে বস্তুগত জিনিস দেওয়া যায় না। সেটা দু:খ দিলেও ছোটরা ভুলে যায়। কিন্তু মনের দারিদ্রের চেয়ে ছোট কিছু নেই। অথচ দু-একটা পিঠ চাপড়ানো, দু-একটা চিয়ারিং আপ ছোটদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। আমাদের পরিবারের নীতিই ছিল আত্মবিশ্বাস জন্মাতে না দেওয়া। বাবা ওরকম ছিল না, কিন্তু বাবা তো ছিলই না তখন। বড়দা খুব উৎসাহ দিত, কিন্তু ওর আসাও ছিল অনিয়মিত।

অর্থাৎ এক রেফিউজি পরিবারে আমি ছিলাম দুই স্তরের রেফিউজি, আমার আশ্রয় ছিল না কোথাও।

এরকমই একটা সময়ে মোহন মাহাতোর সঙ্গে আমার আলাপ। আমার চেয়ে কিছু বড় ছিল বয়সে। ওর সঙ্গে প্রথম ঢুকি চিৎপুরের গলিতে। প্রধানত দরিদ্র মুসলমান অধ্যুষিত ওই এলাকা। 'ভদ্রলোকেরা' যেত না। ওখানে 'রিজেন্ট' নামে একটা সিনেমা হল ছিল। আজ ভাবলে বুঝতে পারি কী বিশ্রী হল ছিল ওটা। ওখানে 'সোনে কি হাথ' বলে একটা হতকুচ্ছিত সিনেমা দেখেছিলাম। আশপাশে রাস্তার ধারে নানান ধরনের জুয়া খেলা হত। একটা চক্র ঘুরিয়ে দেওয়া হত একটা বড় বাটির ওপর দিয়ে। সেটা যেখানে গিয়ে থামবে, সেই নম্বরে যদি আমি দশ পয়সা লাগিয়ে থাকি, তবে এক টাকা ফেরত পাব। আর একটি অধুনালুপ্ত জুয়া ছিল। একটা গোল চাকতি ছুঁড়ে দেওয়া হত সাজিয়ে রাখা বিভিন্ন বস্তুর ওপর। সেসবের মধ্যে সাবান, প্লাস্টিকের বাটি, সবুজ চশমা ছাড়াও আলুলায়িত হয়ে থাকত দশ টাকার নোট। নিয়মিত খেলেও আমি জিতিনি কিছু কোনওদিন। খেলার পয়সা আসত মোহনের কাছে ধার করে। ততদিনে মোহন প্রণবের জায়গা নিয়েছে। এক টাকা ধার নিলে দেড় টাকা ফেরত দিতে হত।

ওখানে গঙ্গার একটা ঘাট ছিল। সেখানে নৌকো বা ভটভটি দেখা যেত। ওখানে বসে থেকেছি কখনও মোহন আর আমি। নদীবেষ্টিত দেশে জন্মেছিলাম বলেই হয়তো জল দেখলে একটা ঘোর লাগত। একনাগাড়ে জলের দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হত যেন দেশে ফিরে যাচ্ছি। সেখানে সবাই অপেক্ষা করে আছে লঞ্চঘাটে। এমনকি বাবাও। অথচ ততদিনে বাবার মৃত্যু উপলক্ষে কেটে ফেলা চুল বেড়ে উঠে ঘাড় ছাড়িয়েছে।

আরিয়ল খাঁর এক শাখানদীতে স্নান করতে যাওয়া হত কখনও। একবার যেমন আমার বড় ভাগ্নে-সহ দিদির আঁতুরবাস কালে আমরা স্নান করতে গেছিলাম নদীতে। স্নানের আগে নতুন শিশুকে আদর করা যেত, পরে নয়। কী ভয়ঙ্কর কুপ্রথা ভাবুন পাঠক। একটা সদ্যোজাত বাচ্চাকে সব চেয়ে নোংরা অবস্থায় স্পর্শ করা এবং সেই অশুচি শোধনে স্নান। আঁতুরঘরের অবস্থা ভাবলে এখনও শিউরে উথতে হয়। স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে মলিন বিছানা, ঘরময় হিসুর গন্ধ, প্রায় ব্যাকটেরিয়াকে কোলবালিশ বানিয়ে জীবন-যাপন। যাঁরা এখনও গদগদে গলায় বলেন সেই মহাসংগ্রামে মানুষের জয় এবং তার শক্তপোক্ত হয়ে বড় হওয়ার কাহিনী, তাঁরা নির্বোধ। ওই সময় শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ছিল ভয়াবহ। এক একটা বাড়িতে, বিশেষত গ্রামে, গন্ডায় গন্ডায় ছেলেমেয়ে জন্মাত বলে মৃত শিশুদের ভুলে যেত লোকে। আমারই ছোড়দার যমজ ভাইটিকে বাঁচানো যায়নি। আরও একটি মৃত সন্তানের জন্ম দিয়েছিল মা, অথবা সেই শিশু জন্মের পর পরই মারা যায়। তার মানে আমাদের মতো মাঝারি অবস্থার বাড়িতেই অনুপাতের হার মৃত : জীবিত - ২ : ৫। গরিব বাড়িতে কী হত ?

তো যাই হোক, সেটা ছিল স্নানে যাওয়ার দিন। ছোড়দা, আমি, হরেকেষ্ট, প্রাণকেষ্ট এ জাতীয় আরও কিছু এন্ডি-গন্ডি লুঙ্গি পরে ছুট নদীর দিকে। কোঁচা মেরে লুঙ্গি পরা। কাশফুল, সর্ষেখেতের মধ্যে দিয়ে রোদ্দুরের সঙ্গে দৌড়। তারপর নদীতে স্নান, আমরা ছোটরা পাড়ের কাছের জলে ঝুপঝুপি, ছোড়দারা করছে সাঁতারের রেস। নদীতে জল কম তখন। না হলে স্নান করার দম থাকত না কারও। এতই কম জল যে ডোঙা গোছের নৌকোও যাচ্ছিল বেশ দূর দিয়ে। মাঝে-মধ্যে শোনা যাচ্ছিল মাঝিদের ডাক আর দু-একটা ভাটিয়ালির টুকরো। ভাঙা গলায় গাওয়া সেই ভাটিয়ালির কাছে আর সব গান ম্লান, বন্ধুরা। ওই সব গান এত রিসার্চের পরেও শহরে পৌঁছবে না কোনও দিন। অ-শিক্ষিত ওই মাঝিরা তাদের নাও নিয়ে, গ্রামীণ সংস্কৃতির চিহ্নগুলোকে সওয়ারি করে মিলিয়ে গিয়েছে। দু-পার বাংলায় লুপ্ত সেই সহজিয়া দর্শন, আউল-বাউল-ফকিরের গান, কারণ শহরে দীর্ঘদিন ধরেই তা পণ্য। রুচিসম্মত পণ্য, মানে কিনা আমার জাতও রইল, পাতও রইল, দুই-চাইর মুঠা ভাতও রইল।

তারপর সেখান থেকে আবার দৌড়ে ফেরা। এবার পরনে কোঁচা দেওয়া গামছা, লুঙ্গিকে দু-হাত ওপর ঘুড়ির মতো তুলে ধরে ছুটে চলা। বাড়ি ফিরতে ফিরতে লুঙ্গি শুকিয়ে খটখটে। চিৎপুর ঘাটে বসে চোখের সামনে খেলে যেত এসব দৃশ্য। এখন চল্লিশ পেরিয়ে আবার ছুটে আসছে তারা। সেই গন্ধ ফিরে আসছে আবার। নদী থেকে ফেরার পথের সেই উষ্ণ বাতাস যেন স্পর্শ করছে গোটা জীবন। মার কথা মনে পড়ছে -- ভিটের কথা।

৭৪ সালে নিশ্চয়ই আরও বেশি করে মনে পড়ত। আরও ঘনিষ্ঠ ছিল নিশ্চয় সেই গন্ধ।

প্রসঙ্গত পাঠক বন্ধুদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে এ-যাবৎ এই লেখায় যে সব 'ছিল' ব্যবহার করা হয়েছে, তা একটা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে। এখনও হয়তো একই ভাবে অন্য কোনও মোহন অন্য কোনও মৃণালকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে রিজেন্ট সিনেমা হল আর বিভিন্ন ধরনের জুয়ার সঙ্গে। হয়তো চারপাশের সব কিছু আজও রয়ে গেছে একই রকম। গ্রামের সংস্কৃতিকে যেমন সহজে খেয়ে ফেলা যায়, শহরের জীবনকে ততটা নয়। তাই হয়তো বেলগাছিয়া বস্তি, চিৎপুরের রাস্তা, গ্যালিফ স্ট্রিট-এর দালাল সব এক রকম আছে, বা বদলে গেছে বাইরে থেকে। কিন্তু চাঁদনির ফুটপাত থেকে পুলিশের হাল্লায় উধাও এম পি থ্রি আর ব্লু ফিল্মের দোকানদারেরা যেমন বাজারের গলির মধ্যে গড়ে নিয়েছে নতুন দোকানদারি, তেমনই চিৎপুরের নানান নেশা আর জুয়ার আড়ৎ হয়তো আজও বিরাজমান এ কলকাতার মধ্যে লুকনো এক অন্য কলকাতায়।

মোহনের সঙ্গে আলাপের গল্পটা এ মুহূর্তে স্মরণীয়। যে ঘটনা শুরু হয়েছিল অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে, কীভাবে তা পরিণত হল পরম বন্ধুতায়। কীভাবে দুর্ধর্ষ ওয়াগন ব্রেকার পল্টুদা দস্যু মোহনকে বন্ধু মোহনে পরিণত করল আমার জন্য, সেই প্রসঙ্গ আসবে এখানে। পল্টুদা এবং তার মতো পরিত্রাতারা বার বার আবির্ভূত হয়েছে আমার জীবনে আমাকে রক্ষা করার জন্য। এ লেখাটাকে বলা যেতে পারে 'মাই ট্রিবিউট টু পল্টুদা'।

টালা পার্ক এভিনিউ-র বাড়িতে তখন সদ্য এসেছি। সাল ১৯৭৫। খেলাৎবাবু লেনের পুরোনো বাড়ি থেকে এই বাড়ির দূরত্ব হাঁটা পথে পাঁচ মিনিট। ডান দিকে হিমানী বাড়ি ছাড়িয়ে সুমিতদের বাড়ি। তার পাঁচ পা আগে একটা মোড়। ডান দিকের রাস্তা চলে গেছে পাইকপাড়ার দিকে, সোজা রাস্তা গিয়ে উঠেছে টালা ব্রিজে, বাঁ-দিকে বাঁক নিলেই আমাদের ভাড়াবাড়ি। একটা বড় বাড়ির সংলগ্ন আউটহাউস সদৃশ দোতলা ছোট বাড়ি। দরজায় দাঁড়িয়ে বাঁ-দিকে তাকালে উঁচু একটা ঢিপি মতো মাঠ। ওখানেই রিভলভার হাতে ঘুরে বেড়াত পল্টুদা। আমিও ঘুরে বেড়াতাম আমার বিষন্নতার দুপুর-বিকেলে। একদিন দেখা হল আমাদের।

পর্ব ১৩

পল্টুদার নাম আমি শুনেছিলাম। এক যুবক সমাজবিরোধী। তার জিনে নেপালি প্রভাব ছিল। ফর্সা, মোঙ্গোলয়েড এই যুবকের বিচরণস্থল ছিল টালার ওই দীর্ঘ উঁচু মাঠ। তাকে আগে কখনও চোখে না দেখলেও তার বাঁশি মানে পিস্তলের গল্প অনেক শুনেছিলাম। কোনও কোনও দিন যখন আমার খেলতে ইচ্ছে করত না, দেশে ফিরতে ইচ্ছে করত, তখন বিকেলে আমি ঘুরে বেড়াতাম ওই মাঠে। একা বসে থাকতাম, স্বপ্ন দেখতাম, গান গাইতাম। দীপক চ্যাটার্জি বা দস্যু মোহন সেজে ক্ষমতালাভের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে থাকতাম। অন্য কিছু লোকজনও আসত এদিক-ওদিক। গোপনে কিছু না কিছু কাজ করত। আমার জানতে ইচ্ছে করত না ওরা কী করছে। একা থাকতেই বেশি ভাল লগত। ওরাও কেউ বিরক্ত করত না, একমাত্র মোহন করেছিল, সে কথা পরে।

একদিন বিকেলে আমি বসে ওরকমই কোনও স্বপ্নচারণ করছি, হঠাৎ শোনা গেল, 'আবে সালা'। তাকিয়ে দেখি এক নেপালি যুবক। মাঝারি উচ্চতার সুগঠিত শরীর এবং চোখে কালো চশমা পরা। 'এখানে কী কচ্ছিস রে ?' আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম,

‘এমনি বসে ছিলাম, চলে যাচ্ছি।’ চোখে তুলে নামিয়ে যুবক আমায় মাপল, তারপর বলল, ‘নাম কী তোর ?’ আমি ডাকনাম বললাম। ওই নামেই আমি পরিচিত ছিলাম। ‘এক প্যাকেট ক্যাপস্টেন নিয়ে আয়’ বলে আমায় একটা পাঁচ টাকার নোট দিল সে। আমি নিয়ে এগোতে থাকলাম। পেছন থেকে ও বলল, ‘নোট নিয়ে ফুটে যাস না। পল্টুর নোট গরম আছে।’

মুহূর্তেই মুহ্যমান আমি -- এই সেই পল্টুদা ! আমার চোখ চলে গেল তার কোমরের দিকে। ও চোখ মারল, ‘আছে বে, আমি সেই পল্টু’। S-দিয়ে ‘সেই’ বলে হাসল পল্টুদা, আমিও বললাম। তারপর দৌড়লাম সিগারেট কিনতে।

‘বে’ কথাটা নিয়ে কিছু বলার আছে। উত্তর কলকাতা বরাবরই স্বপ্নে ডুবে থাকত হিন্দি ছবির। দেব আনন্দের ঘাড় নড়বড়ে কথা বলার ধরন আর রজেশ খান্নার চোখ কুঁচকে আঙুল মাথার ওপর তুলে হাসার বা গান গাওয়ার ভঙ্গি রাস্তায় রাস্তায় অনুসৃত হত। হিন্দি সিনেমার সেই পথ ধরেই ‘বে’ এসেছিল সেখানে। যদিও সিনেমায় বদ লোকেরা ওই কথা বলত কিংবা নায়িকার প্রেমে পড়ার আগে বখা, রাগী এবং দু:খী নায়কেরা, কিন্তু উত্তর কলকাতায় অনেক পাড়ায় আমি কাকা-মেসো গোছের লোকেদেরও কথাটা বলতে শুনেছি। তাই পল্টুদার মুখে ওই সম্ভাষণ যাতে তার চরিত্র বিষয়ে কোনও ভুল ইঙ্গিত না দেয়, সে ব্যাপারটা আগে মিটিয়ে নেওয়া ভাল।

মুহূর্তে সিগারেট এনে দিই আমি। পল্টুদা খুশি হয়। এরপর আমাদের গল্প চলতে থাকে। ওর উচ্চারণে একটা ভাঙা হিন্দি গন্ধ ছিল। সেটা ভাল লাগছিল আমার, আর চোখ চলে যাচ্ছিল ওর কোমরের দিকে। জায়গাটা একটা উঁচু হয়েছিল। একসময় কথা বলতে পল্টুদা লক্ষ করল আমার অস্থির চোখ। হাসল। তারপর কোমরে বেল্ট দিয়ে আটকানো পিস্তলটা বের করে আমায় বলল, ‘দ্যাখ’।

আমি মুহূর্তে মোহ্যমান। এই সেই দুর্লভ পিস্তল যা দিয়ে দস্যু মোহন, দীপক চ্যাটার্জি, জয়ন্ত তটস্থ করে রাখে ভয়ঙ্কর লোকেদের। একটু ঘষা রঙের সেই অলঙ্কারে সেজে থাকা পল্টুদাকে আমার ভগবান মনে হল। যন্ত্রটা আমার হাতে দিল পল্টুদা। আমি বুঝতে পারিনি অত ভারী হতে পারে ওটা। আমার হাত নুয়ে গেল কিন্তু হৃদয় বিকশিত হল। স্বপ্নে ওটার অধিকারী হলাম আমি। আর এক আশ্চর্য ক্ষমতার মোহে জড়িয়ে গেলাম। দুর্বল, লিঙলিঙে কুট্টি, যার চলতে গেলে পেন্টুল খুলে যায়, সেই বালক মনে মনে পিস্তল তাক করল পূর্ব পাকিস্তানের দিকে, তার ভিটে জ্বালিয়ে দেওয়া মুখে কালো কাপড় বাঁধা লুঠেরাদের দিকে। অন্ধকার বর্ষার নদীতে যে মানুষ তাদের বাবার দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়েছিল, তাকে হত্যা করল তক্ষুনি।

পল্টুদাকে ফিরিয়ে দিলাম রিভলভার। তার সঙ্গে সেদিন থেকেই খুব বন্ধুত্ব হল আমার। এই বয়েস-পেরনো বন্ধুত্বের দায়িত্ব নিয়েছিল পল্টুদা। দুবার আমার পরিত্রাতার ভূমিকায় নেমে এসেছিল সে। অনেক বড় ছিল আমার থেকে। বেঁচে থাকলে আজ তার বয়েস নিশ্চয় পঞ্চান্নর বেশি হবে। তাকে আমার ভালবাসা জানাই।

আমাদের গ্রামের দেশে যাত্রা হত আঙ্গারিয়া বাজারে। দোকানদাররা বছরে কোনও একটা দিন যাত্রা করত। ঐতিহাসিক বা সামাজিক পালা। সে যাত্রা যে দ্যাখেনি তার জীবন বৃথা। ভদ্রলোকেদের জন্য রাখা বেঞ্চে বসে আমরা যাত্রা দেখতাম। আর সামনের মাদুর বা ছেঁড়া কাপড়-চোপড়ে বসে যাত্রা দেখত বহু মানুষ। তাদের চেনা সব সামান্য মানুষদের দেখতে এক অসীম রোমাঞ্চে। চেনা অভিনেতাকে দেখলেই বলে উঠতে 'অরে জামাইল্যা, তরে তো মাইরা ফালাইব হারান'। ভিলেনবেশী মাছওলা জামাল এই সব মন্তব্যে কর্ণপাত না করে বীরের মতো এগিয়ে যেত আলুওলা হারানের দিকে। সেখানে একটা দরুণ মুহূর্ত এসেছিল একবার। শুধু সেই স্মৃতিই মনে আছে আমার। বীর কিন্তু ভাগ্যদোষে বন্দী নায়ককে জামাল খুব শাসাতে শাসাতে একবার বলে, 'দ্যাখছস, পিস্তল আছে আমার হাতে ?' এই বলে সে পিস্তল তুলে ধরে নায়কের বীরোচিত মুখের দিকে। এক প্যাঁচে ভিলেনের হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়ে, তারই দিকে অস্ত্র উঁচিয়ে নায়ক বলে, 'কিন্তু অ্যাহন পিস্তল আমার হাতে।' করতালিতে ফেটে পড়ে দর্শকরা। তাদের মধ্যে আমরা মুগ্ধ দু'ভাই, মায়ের পান খাওয়া মুখে তৃপ্তির হাসি, মেজদাদুর বোদ্ধা মুখ, আর আমাদের উত্তেজনা। আঙ্গারিয়া বাজারের ওই এক রাতের বাদশা যার নাম আজ মনে নেই, হারান কাল্পনিক না, সে আমার এক নম্বর হিরো। আমার মনে হয় এরকম কোনও যাত্রা দেখেই প্রথম নাটক লেখার ইচ্ছে হয় আমার। আমি এক পাতার এক অপূর্ব শোকাবহ নাটক লিখি ভীম, হিড়িম্বা আর ঘটোৎকচকে নিয়ে। তাতে যতদূর মনে পড়ে ভীম উর্দুতে কোনও ট্র্যাজিক গান গাইছিল। সে উর্দু অবশ্য আমার নিজের। গানের বেদনাটাই প্রধান ছিল ওই অর্থহীন উর্দুতে। এক পাতাতেই শেষ হয়েছিল ওই অসমাপ্ত নাটক।

বাবার মধ্যে এক নাটকীয়তা ছিল যা শুনেছি অভিনয়ে প্রতিফলিত হত। বাবার অভিনয় আমি কখনও দেখিনি। মাঝে-মধ্যে সুখের দিনে, অর্থাৎ বাড়িতে টাকা আসার দিনে, বাবাকে তেমন করে ধরলে বাবা ওইতিহাসিক নাটক থেকে কিছু কিছু লাইন বলে দিত। মীর কাশিমের বিখ্যাত সংলাপ, 'বাংলা, বিহার, ওড়িশার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা, তোমাকে আমরা ভুলিনি জনাব।' বলার সময় বদলে যেত বাবার মুখ। কোথায় যেন সমস্ত দৈন্য, সব ম্লানতা মুছে দিয়ে এক অভিনেতার

মুখ ভেসে উঠত ঝাপসা কাচের মধ্যে দিয়ে। জীবনে ভুলব না বাবার ওই বদলে যাওয়া মুখের ছবি।

একবার বেশ রাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার। তখন একা হিশু করায় বাধ্য করা হয়েছিল আমাকে। উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে সেই কম্মো করতে করতে বাবার দক্ষিণের ঘর থেকে শোনা যাচ্ছিল অনুচ্চ কিন্তু আবেগে মাখা কিছু সংলাপ। আমি পায়ে পায়ে সেদিকে এগোই। গিয়ে দেখি ভেজানো দরজার মধ্যে দিয়ে আনাড়ি অভিনেতার ভঙ্গিতে দাঁড়ানো বজুকে। বাবাকে দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু একটু-আধটু জড়ানো গলা শোনা যাচ্ছিল। ওই গলা শুনে কেমন ভয় ভয় করছিল। দৌড়ে পালিয়ে এসেছিলাম উঠোন থেকে। এ কথা আর কেউ জানে না। মাও না। তাছাড়া মা এখন মিশে আছে আঙ্গারিয়া বাড়ির উঠোনের ঝরাপাতার মধ্যে। সেখানে যেতে খুব ইচ্ছে করে আজকাল।

আমার এই অপরাহ্নরেখা সন্ধানে খুব সাহায্য করেছে ছোড়দা। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম বাবা মদ খেত কিনা। ছোড়দা বলেছিল, মৃতসঞ্জীবনী-সুরা জাতীয় কিছু খেত। ওসব সুরা আমি যুবক বয়সে দু-একবার খেয়ে দেখেছি। ওতে কিস্যু হয় না। পনের বছরের বালক হয়তো গোটা এক বোতল খেয়ে ফেলল ভাল ঘুমোবে। হয়তো পরদিন স্কুল বাস মিস করবে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের কচু হবে ওতে। আমার বিশ্বাস ওই ঢপের সুরার বোতলে দেশজ মদ পান করত বাবা। রোজ করত কিনা বলতে পারব না। তবে তাতে কী আসে যায় ?

এর দীর্ঘ দিন পরে আমার পার্ট ওয়ান পরীক্ষা শেষে চুনিকাকুর বাড়ি গিয়েছিলাম কল্যাণীতে। বনগাঁর কলেজে তখনও পড়াচ্ছে কাকু, কিন্তু ছোট্ট একটা সুন্দর বাড়ি করেছে কল্যাণী ঘোষপাড়ায়। তোতন তখন এম এ পাশ করে এম ফিল করছিল মনে হয়। একদিন জমিয়ে কাকিমা, আমি আর তোতন গল্প করছি ভেতরের ঘরে। আমি হয়তো চেঁচিয়ে কিছু বলছিলাম। হঠাৎ বাইরের ঘর থেকে কাকু দ্রুত ভেতরে এল। অদ্ভুত দৃষ্টি। আমাকে অচেনা মানুষ দেখার ভঙ্গিতে বলল, 'কী অদ্ভুত ! মনে হল দাদার গলা শুনলাম। একেবারে দাদার গলা।' বলতে বলতে চলে গেল অন্যমনা অন্য ঘরে। আমার গা শিরশির করে উঠল। তখন শেষ বসন্ত। বাবার জন্য আবার কেমন যেন লাগল আমার। বাবা একবার বলেছিল, 'বাজাও নীল আকাশ'। তারপর কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। এসব কথা মনে পড়ে গেল আমার। রক্ত জলের চেয়ে কত ভারী ?

এখন যখন আমার এই আখ্যান ৫০ শতাংশের বেশি পথ পেরিয়ে এসেছে, তখন একটা কথা বলা দরকার আমার পাঠক বন্ধুদের ('পাঠিকা' আমার কাছে অব্যবহারযোগ্য -- সবাই পাঠক)। ১৯৮৭-৯১ সালে আমি যখন আনন্দবাজারের

বিজ্ঞাপনে বিভাগে একটা ক্ষুদে চাকরি করি, তখন 'রক্তমাংস' পত্রিকায় 'আমার এই অপরাহ্নরেখা' নামে এক দীর্ঘ কবিতা ছাপা হয়েছিল। সে ছিল এক ২৫-২৬শে যুবকের নাগরিক প্রতিফলন। এখন এই লেখা লিখতে গিয়ে বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে 'কীভাবে কেটেছে দিন তুমি বুঝি ভুলেও ভাব না' এই লাইনটা। আমার বন্ধু ঈশিতা মিত্রর (পরে মুখোপাধ্যায়ের) একটা কবিতার প্রথম লাইন। ছাপা হয়েছিল আমাদের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অরণি' পত্রিকায়। কীভাবে কেটেছে দিন, আঙ্গারিয়া থেকে, যাবতীয় টালমাটাল অভিজ্ঞতার ভুলো পথে কীভাবে কেটেছে দিন। শ্যামবাজার হাই স্কুলে (এ ভি স্কুল নয়) পড়ার সময় স্কুল কেটে উত্তরায় 'সওদাগর' দেখতে গিয়ে ভূগোলের মাস্টার তপনবাবুর হাতে নাকাল হওয়া, এমারজেন্সির কলকাতায় প্রথম পুলিশের হাতে ধরা পড়া, প্রথম পুন্যিকে দেখে বসন্ত সমাগম আবার অনেক অনেক দিন আগে প্রথম স্মরণাগত জ্বরের পর পাকিস্তানি বাড়ির দাওয়ায় বসে আছি। মা এসে গায়ে জড়িয়ে দিচ্ছে চাদর। জিভ তেতো ক্লান্ত বার্লি খেতে খেতে। তখন ওই বহমান অঙ্গনজলে কী দেখেছিল শিশু ? কীভাবে যে কাটল দিনগুলো ?

ফিরে আসি পল্টুদার কথায়। কিছুদিনের মধ্যেই আমাকে তার কাছে সাহায্য চাইতে হয়। কারণ মোহন মাহাতো নামের একটি ছেলে খবর পেয়ে গিয়েছিল যে আমি খুব ভাল মুরগি। সে আমাকে দেখা হলেই ভয় দেখাতো, বাড়ি থেকে টাকা বা বাসন-কোসন এনে দিতে বলত কোনও অজ্ঞাত কারণে। আমি তাকে দেখলেই পালিয়ে যেতাম। এতে মোহনের সাহস বাড়ছিল। একবার সে আমাকে আক্রমণ করল। ওই ঢিপি গোছের মাঠেই। একেবারে অকারণে।

তখনও টালা পার্ক এভিনিউতে আমার কোনও বন্ধু হয়নি। অথচ খেলাৎ বাবু লেন থেকেও আমি সরে গেছি। পাশাপাশি দুটো পাড়া হলেও টালা পার্কের ছেলেমেয়েদের হাতে পয়সা কিছু বেশি। তার গ্ল্যামার আমাকে আকর্ষণ করত। কিন্তু বন্ধুত্ব হয়ে উঠছিল না। তাই নিঃসঙ্গ আমি ঘুরে বেড়াতাম ওই ঢিপিতে। নিজের ইচ্ছে মতো খেলতাম। যৌন কৌতূহল বেড়ে উঠছিল, কিন্তু তা এমনকি সাময়িকভাবে মেটাবার কোনও রাস্তাই খুঁজে পাইনি তখনও। ওই উঁচু মাঠে খেলাটা ছিল সব স্বপ্ন পূরণের একমাত্র রাস্তা। মোহন ওখানে খুব বেশি যেত না। তাই নিশ্চিন্তে ছিলাম। একটা লম্বা গেট টপকে, তার ওপর থেকে ঝুপ করে নিচে নামলেই মাঠ, আর একবার মাঠে পৌঁছে গেলেই ব্যাস। কোনও চিন্তাই নেই।

একদিন ওই মাঠে আমাকে ভয় দেখাতে নেমে এল মোহন মাহাতো।

পর্ব ১৪

মোহন জানত আমি মুরগি। এবং সেই নি:সঙ্গ মুরগির বিচরণস্থল যে ওই মাঠ, তাও জানত সে। একদিন মাঠে ঢুকেই তার মুখোমুখি হলাম। আমার জন্য অপেক্ষা করছিল মোহন। দেখা হতেই এগিয়ে এসে বলল, এখানে এলে আমাকে টাকা দিতে হয় জানিস না ? আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, না, জানতাম না। আমার কলার ধরে ধাক্কা মারল মোহন। এখন তো জানলি, মাল দে। আমি বললাম, আমার কাছে টাকা নেই। আবার ধাক্কা মেরে আমাকে মাটিতে ফেলে দিল মোহন। আমি কাঁদতে কাঁদতে উঠে গেট বেয়ে ওপরে চড়ার সময় কয়েকটা ঢিল খেলাম পিঠে-মাথায়। কোনও রকমে উল্টো দিকে লাফ মেরে নামার সময় একবার দেখলাম, মোহন হাসছে। ওই হাসির অপমানটা মন রয়ে গেল আমার। রাতে একা শুয়ে পল্টুদার দেওয়া পিস্তলে মনে মনে মোহনকে মারলাম আমি।

আমি বেশ কয়েকবার প্রমাণ পেয়েছি যে ইচ্ছে-পূরণের কিছু দিন বা মুহূর্ত আসে আমাদের জীবনে। এর পেছনে আধিদৈবিক কারণ আছে কিনা তা জানার দরকার হয়নি। আধি হো ইয়া পুরি, দৈবিক ব্যাপারে ভরসা চলে গেছে শৈশব থেকেই। বরং এ ধরনের যোগাযোগকে কাকতালীয় বলা যেতে পারে। এক তাল গাছে কাক বসে থাকা বিকেলে ওই মাঠে পল্টুদাকে ঘুরে বেড়াতে দেখে আমি হুড়মুড় করে গেট পেরিয়ে নামলাম। কী আশ্চর্য, সে-দিনই মোহন আবার মৃণাল-মুরগি খুঁজতে বেরিয়েছিল। আমার ঝুঁটি দেখে দৌড়ে এল সে। খেয়াল করল না কালো পোশাক পরে পাশে বসে থাকা পল্টুদাকে। ততক্ষণে আমি গল্পটা ওকে বলে ফেলেছি। মোহন কাছে আসামাত্র পল্টুদাকে তাকে এক হাত দিয়ে ধরল শক্ত করে। ঠাঁটিয়ে কয়েকটা থাপ্পড় মারল তাকে। তারপর সেই ম্যাজিক পিস্তলটা ভরে দিল মোহনের মুখে। মোহন এক অদ্ভুত কান্না কাঁদছিল পিস্তলের নল মুখে নিয়ে। আমার দেহ-মন পুলকিত হয়ে উঠছিল সেই কান্নায়। পল্টুদা পিস্তল বের করে নিয়ে বলল, ফির কভি এয়সা হো তো উড়া দুঙ্গা। যা সালা, ফোট।

আবার সেই গালফাটানো থাপ্পড়। মোহন ভ্যাঁ অবস্থায় নালে-ঝোলে দৌড়। পল্টুদা ধর্মেন্দ্রর মতো দরাজ ভঙ্গিতে বলল, যা বেটা। খেল। এ যদি ভগবান না হয়, তবে কে ভগবান ?

দেশে থাকতে একটা ফুটবল খেলা দেখতে গিয়েছিলাম কোথাও। তার একটা জটিল প্রস্তুতি ছিল। দর্শকেরা লাঠি, সড়কি ইত্যাদি নিয়ে তৈরি হচ্ছিল দুপুর থেকেই। খেলার চেয়ে দাঙ্গার তাগিদ যে বেশি তা নিয়ে সন্দেহ ছিল না। কোথাও খেলা দেখতে গিয়েছিলাম মনে নেই। কিন্তু খেলা চলাকালীন দর্শকদের দেখে বুঝতে পারছিলাম

তারা একটা সুযোগ চায়। এই অবস্থায় কোনও টিম অন্য টিমকে গোল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুপুর উন্মত্ত হয়ে ওঠে। শুরু হয় বেদম মারপিট। আমরা দু-ভাই সপাটে দৌড়।

আমি সব সত্যি কথা বলতে বা লিখতে পারব না। নিজের অনেক অপরাধের কথা লিখতে পারব না। হয়তো পারব আজ থেকে দশ বছর পরে। ততদিনে হয়তো আমি দেখে এসেছি নিজের ছোটবেলার গ্রাম। পালং-এর নাম বদলে এখন হয়েছে শরিয়তপুর। সেখানে সম্ভবত এখন খোলা হয়েছে সাইবারকাফে। আমি সে পথেও চেষ্টা করেছি। বাংলাদেশী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে নেট-এ যোগাযোগ করে কিছু তথ্য চেয়েছিলাম নিজের মোকামের হদিশ পেতে। ভদ্রলোক উত্তর দেননি। চ্যাটোৎসাহী ওই ভদ্রলোক এর পরেই নিশ্চয়ই 'এ এস এল'-এর মূর্খ খেলায় মেতে উঠেছিলেন শরিয়তপুর থেকে। আ মরি বাংলা ভাষা।

পালং থানার ওসি ছিলেন হক সাহেব। সিনেমা দেখার পথে তাঁর বাড়িতে সৌজন্যমূলক কিছু সময় কাটিয়েছিলাম আমরা। প্রচুর পরিমানে চা-মিষ্টি গিলে দেখেছিলাম হক সাহেবের বালিকা কন্যার নাচ-গান। 'মোমের পুতুল মমির দেশের মেয়ে নেচে যায়' দেখে-শুনে যারপরনাই মুগ্ধ আমরা বাঙাল পরিবার পালং-এর সিনেমা হলের দিকে রওনা হয়েছিলাম। আমার চেয়ে দু-চার বছরের বড় ওই মেয়েটির নৃত্যবিলোল ভঙ্গি আমার মুগ্ধ করেছিল। আমি জানি না কোথায় ছিলেন হক সাহেব যখন আমাদের বাড়ি-ঘর লুঠ করা হয়। নিশ্চয়ই নিজের পরিবারকে, ওই বালিকাকে বাঁচাতে ব্যস্ত ছিলেন। মুসলমান বলে তাঁকে ছেড়ে দেবে এমন কাঁচা ছিল না পাঠান মিলিটারি বা তাদের ফেউ নেড়ি কুত্তা রাজাকারেরা। সমস্ত প্রশাসন তারা তুলে নিয়েছিল নিজেদের হাতে। সাধারণ বাংলাদেশী কখনও বোঝেনি, হয়তো বুঝবে না, যে পাঠানের চোখে, মিলিটারি চোখে, সমস্ত বিদেশী মেয়েই ধর্ষণযোগ্য। পুব অঞ্চলের মুসলমান আর হিন্দুকে তারা একই চোখে দ্যাখে। বাংলাদেশী হতদরিদ্র মনুষেরা হয়তো পাকিস্তানী স্বপ্নে বিভোর এখনও। পাকিস্তানের পোষা কুকুরগুলো এখনও বেঁচে আছে অদূর বাংলাদেশে, এর চেয়ে ঘৃণ্য কোনও কিছু ভাবা যায় না আজও। কাঞ্চনদার আত্মা অভিশাপ পাঠাচ্ছে তাদের জীবন্ত দিনগুলোয়। শামসুর রহমান চলে গেলেন কদিন আগে। 'তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা, আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায় ?' ভাবতে কষ্ট হয় যে বাংলাদেশের জনসমষ্টির মাঝখানে আজও বেঁচে আছে রক্তগঙ্গার ওই পরজীবীগুলো। বেঁচে আছে তাদের সন্তান-সন্ততি। তাদের কারও চোখে বাবারা হয়তো হিরো। বেঁচে আছে হিটলারের অনুগামীরা। আর সবার ওপরে ছাতা ধরে আছেন পিতামহ জর্জ বুশ আর বশংবদ পিতামহী জন ব্লেয়ার। তাঁদের নিজ নিজ দেশের ভিত না নড়লে তাঁরা সুদূর প্রাচ্যের 'ইক্সটিক' কাহিনী শোনাতেন পরবর্তী প্রজন্মকে। আজ সেই ছাতায় অজস্র ফুটো। মনে রাখবেন, পাপ এক ব্যাধি। দীর্ঘশ্বাস এক অভিশাপ। এর মধ্যেই উড়ে গেছে 'টুইন টাওয়ার্স' আর চিড় ধরেছে লন্ডনের টিউবে। 'দ্য সেন্টার ক্যাননট হোল্ড'। কারণ সেন্টারের গর্ভেই ছিল পাপ। 'তবে হয়তো

মৃত্যু প্রসব করেছিস জীবনের ভুলে'। আমি ইসলামিক বাংলাদেশের সমস্ত রিটায়ার্ড রাজাকারদের কঠিন মৃত্যু কামনা করি। আমি ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের সব ধর্মের মানুষের তিন অবতারের পুজো করছি এই দু-হাজার ছয়ের পঞ্চমীর রাতে। আমার রবীন্দ্রনাথ, আমার নজরুল এবং আমার লালন। আমি চাই বাংলাদেশের সংবিধান থেকে অচিরে মুছে যাক 'ইসলামিক'শব্দটি। রাষ্ট্রযন্ত্র ভাবুন হাসন রাজার গান : 'কী ঘর বানাইলাম আমি শূন্যের মাঝারে।'

কিন্তু বাস্তবত, আমরা জানি, কেউ কিছুই ভাববে না। হত্যাকারী কলার ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে নিলাজ দুনিয়ায়। কানাডা বা আমেরিকায় ঘর বসিয়ে মুছে ফেলবে নিজের অতীত। অভ্যাসবশত সাহায্য করবে 'আল কায়েদা'-কে। বিকৃত আরবিতে উচ্চারণ করবে তার নিজস্ব বয়ান। তার ষোল বছরের ছেলে বুকে বোমার মালা পরে শহিদ হবে। অথচ তার খেলাধুলো করার কথা। তার স্বপ্ন দেখার কথা পাশের বাড়ির মেয়েটিকে নিয়ে। বন্ধুরা, দুটো সিনেমা দেখে নিন। প্রথম 'ওসামা', আর দ্বিতীয় 'প্যারাডাইস নাউ'। যথাক্রমে আফগানিস্তান এবং প্যালেস্তাইনে তৈরি দুটি বিস্ফোরক ছবি। বুঝুন স্বপ্ন কি এবং গন্তব্য কোথায়। তারপর ভাবুন আজও দরকার আছে কিনা ধর্ম নিয়ে এরকম বেহুদা ব্যবসা করার।

আক্রমণকারীদের ওপর আমার এক অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল এটা আমি বুঝতে পেরেছি বারবার। নাহলে মোহন মাহাতোর সঙ্গে আমার এরপর তীব্র বন্ধুত্ব হত না। আর সেই বন্ধুত্ব না হলে আমি বুঝতেই পারতাম না যে এ কলকাতার মধ্যে আছে আর একটা কলকাতা। আমার ভাঙাচোরা উদ্বাস্তু জীবনের গল্প ভরে আছে বিভিন্ন টেনশনে, বিভিন্ন ক্ষুধায়, বহু যন্ত্রণায়, অনেক প্রতীক্ষায়। কিন্তু আজ, এই চুয়াল্লিশে পৌঁছে আমি বুঝতে পারি যে এসব ওঠানামা না থাকলে কোনও মানেই হত না বেঁচে থাকার। আমার কোনও অভিযোগ নেই, কোনও ক্ষোভ নেই কারও প্রতি। যত মোহন, ভোলা, বাবুন, ভাইয়া আমার জীবনে এসেছে, তাদের সবাইকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

মোহনের সঙ্গে কীভাবে বন্ধুত্ব শুরু হল তা আজ মনে নেই। মনোহর একাডেমিতে খুব বাজেভাবে নেহাতই পাশ করে যাওয়ার পর আমাকে ভর্তি করা হয় শ্যামবাজার হাইস্কুলে। আমার এক কাকা সেখানকার মাস্টারমশাই ছিলেন। তাঁর দেখাশোনায় আমি ভাল থাকব, অভিভাবকদের এই ভরসায় ক্লাস সেভেনে আমি ভর্তি হই ওই স্কুলে। বাগবাজার বাটার পাশের গলি দিয়ে সোজা হেঁটে গেলে বাঁ হাতে শান্তি ঘোষ স্ট্রিট। একদা এঁদো গলির থেমে যাওয়া মোড়ের অত্যন্ত সাধারণ স্কুলটি, কদিন আগে শুনলাম, উঠে যেতে বসেছে। বছর খানেক আগে চলে গেল পুলককাকু, যে কিনা ভগবান ছিল আমার ক-বছরের স্কুলজীবনে। কাকিমা আজ বদ্ধ উন্মাদ, যে কিনা আমায় রবীন্দ্রনাথের গান শেখাত দুপুরবেলায়। 'মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো' গাইত কাকিমা আর আমি গলা মেলাতাম। এরপর আমি গাইতাম কাকিমা বাজাত।

স্কেলে ভুল হত আমার। আমায় বকত কাকিমা। কিন্তু অত ভালবাসার অত ভালবাসা এক জীবনে কেউ পেতে পারে না। আমি পেয়েছিলাম। কুট্টিদাদু তখন নেই, অনেকদিন ধরেই নেই। দুপুরবেলা স্কুল থেকে কোনওমতে বাসভাড়া যোগাড় করে একবার পৌঁছলেই হত নর্দার্ন এভিনিউ-তে। ভীষণ খিদে পেত তখন। কাকিমাকে বলতে হত না। কী করে যেন বুঝত। খেতে দিত। ফেরার সময় দু-এক টাকা হাতে ধরিয়ে দিত কায়দা করে। সন্ধের আলোছায়ায় রাস্তা পার হতে হতে বুক ভরে নিশ্বাস নিতাম আমি।

তা বলে জীবন কি খুব বদলে গিয়েছিল ? মোটেই না। মোহনের হাত ধরে তখন আমি কলকাতা চিনছি। এক বৃষ্টির দুপুরে গ্যালিফ স্ট্রিট ধরে হাঁটছিলাম দুজনে। আমার হাতে ছিল একটা পেতলের ঘটি। সিনেমা দেখার যে দুর্বার আকর্ষণে জড়িয়ে পড়েছিলাম আমি, তাতে মোহন ছিল আমার পকেট-ফুটো গাইড। গ্যালিফ স্ট্রিটের একটা কাঁসা-পেতলের দোকানে ওই ঘটি বিক্রি করে আমার সিনেমা দেখার টাকা হয়। সম্ভবত 'কহানি কিস্মত কি' দেখেছিলাম ছায়া সিনেমা হলে। বাড়ির ঘটি চুরির টাকায় সিনেমা দেখার ব্যাপারে আমার কোনও অপরাধবোধ ছিল না।

পড়াশুনো একই অবস্থায় -- নড়বড়ে। অঙ্কে ভয়ানক খারাপ। কাকু অত কঠোর ছিল না যা হলে আমার 'ভালো' হত। পিতৃহীন ভাইপোর প্রতি অসীম মায়া ছিল এবং আমি আরও সহজে বখে যেতে পারছিলাম।

একটা ব্যাপার জীবন থেকে একেবারেই চলে গিয়েছিল -- দেশে ফেরার কল্পনা, যা বহুদিন ধরেই ঘিরে রেখেছিল আমাকে। তাই কলকাতা এক অস্থায়ী বাসস্থানের ওপরে উঠতে পারেনি মনে মনে। মনে হয় বাবা আর আসবে না, এই বিশ্বাস মাথায় ঢুকে পড়েছিল, দিদি দীর্ঘদিন আগেই চলে গিয়েছিল রেফিউজি জীবনের চিহ্নবহ ছেলেদের নিয়ে। দান্দার স্মৃতি ফিকে হয়ে আসছিল। এক কথায়, টালা পার্ক এভিনিউ-এর নতুন বাড়িটা একটা সিম্বলের মতো কাজ করছিল তখন। এভাবেই আমরা ধীরে ধীরে রেফিউজি লাইন থেকে মূল স্রোতে ঢুকে পড়ি।

পর্ব ১৫

রজনীকান্ত চক্রবর্তী ব্যবসায়ী ছিলেন। দীর্ঘদেহী শক্তিমান মানুষ। তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে একজন ছিলেন শক্তির সাধক। শ্মশানে বসে সাধনা করতেন। ঠিক কীভাবে আঙ্গারিয়ায় এসে পৌঁছন চক্রবর্তীরা, কীভাবে 'বাগচি' থেকে 'চক্রবর্তী' উপাধি লাভ করেন, তা জানা যায় না। বরাবরই তাঁরা এ অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন কিনা, জানি না

তাও। তখনকার দিনে, বিশেষত গ্রামদেশে, পূর্বপুরুষেরা বাস করতেন লোককথায়। ব্যক্তিমানুষটি হারিয়ে গিয়ে অহরহ জন্ম দিত আইকনের। এর ফলে বংশ পরিচয় মুছে গিয়ে মিথ-এর উদ্ভব ঘটত। রজনীকান্তর তিন পুত্র সন্তান ছিল -- জ্ঞানেন্দ্রনাথ, প্রতুলচন্দ্র এবং অতুলচন্দ্র। এই নামকরণের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথের ধ্বনিগত অবস্থান পৃথক, মানুষটির মতোই। এঁদের কোনও এক বোন ছিলেন যাঁকে আমরা দেখিনি। একটা রুপোর পানের কৌটো দীর্ঘদিন বাড়িতে থেকে গিয়েছিল। তার গায়ে লেখা ছিল 'গিরিবালা'। উনি দান্দার স্ত্রী ছিলেন। আমরা দু-ভাই তাঁকে দেখিনি। মহিলারা সেই কালে মিথযোগ্য ছিলেন না মনে হয়। তাঁদের ঘিরে এক রকমের পাঁচালি গোছের গপ্পো বানাত কেউ কেউ। তিনি কত সেবাপরায়ণা ছিলেন, কী দারুণ রান্না করতেন এই সব গপ্পো। গ্রামের মহিলামনের চিহ্ন দেখি না কোথাও, শহরেই বা দেখি কতটুকু ? 'গিরিবালা' নাম লেখা সেই পানের কৌটো অনেক দিন থেকে গিয়েছিল আমাদের বাড়িতে। মা পান খেত খুব। শেষ জীবনে যখন দাঁত-টাত পড়ে গিয়ে বাঁধানো দাঁতের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছিল, তখন বায়না ধরত পান খাবার। বকাবকি করেও সুপুরি ছাড়া পান এনে দিতাম, সঙ্গে এককুঁচো জর্দা। খেয়ে মা তুরীয় আনন্দ উপভোগ করত। এর মধ্যে কোনও একটা সময়ে 'গিরিবালা' হারিয়ে গেলেন। আমি বিক্রি করে দিইনি, বিশ্বাস করুন। গিরিবালার গায়ে ধীরে ধীরে ময়লা জমা হচ্ছিল আর আমরাও মনে মনে সরে যাচ্ছিলাম সেই জন্মভূমি থেকে, সেই গন্ডগ্রাম থেকে, যা আজ আবার ভীষণ ডাকছে। যদিও চিহ্ন নেই কোনও কিছুর আর, যেমন শুনেছি অন্যদের মুখে। কিন্তু ছোড়দি আছে। ওর কাছ থেকে বাকি গল্পটা শোনার ইচ্ছে আছে। সেটা একদম অন্য গল্প হবে। একটা প্রেমে পড়ে যাওয়া বাচ্চা মেয়ের গল্প। সেটা শুনতে যাব ওদেশে।

তিন ভাই তিন রকম। দান্দা আর কুট্টিদাদুর মধ্যে একটা মিল ছিল -- দুজনেই জুয়াড়ি। চূড়ান্ত রেসুড়ে -- হেরো তাই বেহেড রেসুড়ে ছিলেন। কিন্তু কুট্টিদাদু ছিলেন অনেক বেপরোয়া। দান্দা শুনেছি এত খেতাব এবং রোয়াবের মধ্যে থেকেও খুব ভিতু ছিলেন। ছোটবেলায় আমারও মনে আছে খেলাৎবাবু লেনে থাকার সময় আমি ছবি আঁকতাম। একই ধরনের প্রোফাইল, কালো চশমা পরা লোক। গুন্ডাও হতে পারে, ডিটেকটিভও। গোঁফ থাকলে গুন্ডা বলে ধরে নেওয়া যায়। এদের প্রত্যেকের হাতেই বাঁকানো ছুরি বা রিভলবার থাকত। এই সব ছবি দেখে দান্দা খুব অস্বস্তিতে পড়ে যেতেন। ন-দশ বছরের ছেলের হাতে আঁকা সেই সব ছবি দান্দার মনে হত পুলিশকে সতর্ক করে তুলতে পারে। মেজদাদুর মৃত্যুর পর এই দান্দাই ঘর বদলে আমাদের ঘরে চলে এসেছিলেন। মেজদাদুর ভূতের ভয়। মনে খুব আনন্দ হলে দান্দাকে একটাই গান গাইতে শুনেছি -- একটাই লাইন -- নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো। একটা চমকপ্রদ গল্প বানানো যেত দান্দার রায়সাহেব হয়ে ওঠার। কিন্তু সেই কাহিনির রসদ নেই আমার কাছে। দান্দা খ্যাতির মাঝ আকাশে ছিলেন হয়তো পাঁচ-এর দশকের শেষ ভাগ পর্যন্ত, আমার জন্মের আগে। বড়দা আমার থেকে সতেরো বছরের বড়, তাঁর জন্ম ১৯৪৫-এ। মানে মা-বাবার বিয়ে ধরে নেওয়া যায় হয়েছিল

অন্তত ১৯৪৪-এ। সেই বিয়েতে লালমুখো সাহেবরা এসেছিল অতিথি হয়ে। ওই জলাজমি, সাপ, মশার দেশে সাহেবদের আসা নিশ্চয় দান্দার জনসংযোগ বা দাপট নির্দেশ করে। তারপর স্বাধীন ভারতের তালপুকুরে ঘটি ডুবিয়েও কেটে যায় বহু বছর। দান্দা জন্ম দেন, চালু করেন, এক পরমপরার যা কিনা গ্রামীণ সামন্ততন্ত্র-লালিত। বদলে যাওয়া সময়ে এই প্রথা যে টিকবে না, তা বোঝেননি জ্ঞানেন্দ্রনাথ। বাবাও বোঝেনি। অভ্যাসমতো তর্জন করেছে অন্যদের, তারাও সহ্য করেছে সব, অভ্যেসের বশেই। কিন্তু দিন বদলাচ্ছিল।

টুকরো টুকরো আওয়াজ, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ভেসে বেড়াচ্ছিল কচুরিপানার মতো। সবাই জেনে ফেলেছিল যে রায়সাহেব হালকা হয়ে যাচ্ছেন। হালকা হয়ে যাচ্ছে পরিবার।

আমার দুই কাকা শুনতে পাচ্ছিল ওই কালের যাত্রার ধ্বনি। তারা পালিয়েছিল কলকাতায়। চুনিকাকু আর মনিকাকুর সঙ্গে মায়ের নাকি তীব্র ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বাবা-মার বিয়ের পর পর। গল্পে শুনেচি যে দেওরযুগল আর সমবয়সি বৌদিতে মিলে খুব হুল্লোড় হত বাড়ির চৌহদ্দিতে। পুকুরে বেদম সাঁতার কাটা হত। কাকারা কলকাতায় যাওয়ার পরে আমি আন্দাজ করতে পারি মার নি:সঙ্গতার যন্ত্রণা। কিন্তু তবু প্রত্যাশা ছিল কাকাদের ছুটিতে বাড়ির ফেরার। শুনেছি সেই দূর অতীতে আমার ছোটবেলায় দেখা এককত্তে নদী ছিল উত্তাল। গরমের ছুটিতে দেওরদের আসার প্রতীক্ষায় কি সেজে বসে থাকত সেই বাচ্চা মেয়েটা ? চুনিকাকু এবং মনিকাকু গান গাইত শুনেছি। কী গান ? প্রধানত রাগসঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথ বা এখন মনে হয় কারও মুখে শুনেছি, শচীন কত্তার গান। শহুরে ভঙ্গিতে নস্যি নেওয়া সেই শীর্ণ যুবকদ্বয় সুন্দরী বৌদিকে এন্টারটেন করছে 'তুমি যে গিয়াছো বকুলবিছানো পথে' শুনিয়ে, হয়তো নিজেদের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে অশুভ ত্রিকোণদ্বন্দ্বে। মা হয়তো সাজগোজ একটু বেশিই করছে ঠাকুরপোরা দেশে এলে। বাবা কি বুঝতে পারছে কিছু ? বাবা কি কিছুই বুঝছে না ? নাকি পাত্তা দিচ্ছে না ? নাকি অসম্ভব বিশ্বাস তার ? নাকি গ্রামীণ পলিটিক্সে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়তে পড়তে, দান্দার দাপটের প্রতিফলিত আঁচে গা সেঁকছে বাবা ? বাবা বেরিয়ে যাচ্ছে মাকে ঘর-গেরস্থালীর মধ্যে রেখে এক নিটোল ত্রিকোণে ?

এরপর একটা দিন আসবে যখন কাকারা আর আসে না। পাশ-টাশ করে তারা কেউ প্রেমে পড়ছে, বিয়ে করছে, কেউ অখন্ড প্রেমহীনতায় একা থাকছে মেসবাড়িতে, সারা জীবন থেকে যাচ্ছে। চুনিকাকুর গল্প প্রথমটা, দ্বিতীয়টা মনিকাকুর। আর মা সূর্যাস্তের স্টিমার আসার শব্দে একটু আনমনা হয়ে যাচ্ছে কি ? চুইন্যা আইল না, মনি আইল না, স্টিমার চইলা গেল।

মেট্রো গলির শ-এর বারে মদ্যপান করতে গিয়ে আমি জীবনে হয়তো দ্বিতীয় এবং আজ পর্যন্ত শেষ বার মনিকাকুকে দেখি। স্পষ্ট মনিকাকু। মদ খাচ্ছে কথা বলতে বলতে। আমার ভেতর থেকে খুব ইচ্ছে করছিল মনিকাকুর সঙ্গে কথা বলতে যে আমহার্স্ট স্ট্রিটের একটা মেসে থেকে গেল সারা জীবন। একমাত্র চুনিকাকু আর কুট্টিদাদুর পরিবারের সঙ্গে আবছা সম্পর্ক রেখে। যে কিনা দান্দার মৃত্যুর পর মাথা কামাতে চায়নি। কুট্টিদাদুর অনুরোধে বাধ্য হয় শেষে। আজও থেকে বত্রিশ-তেত্রিশ বছর আগে একটা মানুষের মধ্যে এত ঘৃণা কেন ছিল তার বাবার প্রতি ? বাবা তাদের জন্য কিছুই করেনি বলে ? দায়িত্বজ্ঞানহীন একটা জীবন কাটিয়েছে বলে ? ছেলেকে ভুলে গেছে বলে ?

মদ খাচ্ছিল মনিকাকু। গল্প করছিল। আমি খুব চেষ্টা করলাম তার দিকে হাত তুলতে, চোখের ইশারা করতে। কিন্তু মনিকাকু স্পষ্টই চেষ্টা করতে লাগল আমাকে এড়াতে। ১৯৯২-৯৩-এর ঘটনা এটা। আমার বয়স তখন ৩০-৩১। যে কুট্টিকে মনিকাকু শেষবার দেখেছিল তার বয়স ছিল ১০-১১। চেহারায় কোনও সাদৃশ্য নেই। তবু কেন মনিকাকু এড়াতে চাইছিল অচেনা একটা মানুষকে ? ওর একবার আমার দিকে তাকানো দেখেই আমি বুঝেছিলাম আমাকে চিনতে পেরেছে। মনিকাকু যে প্রজন্মের লোক তাতে সে নাই চাইতে পারে ভাইপোর সঙ্গে শুঁড়িখানায় মুখোমুখি হতে। কিন্তু চিনল কী করে আমাকে ? এমন ছটফট করতে লাগল কেন ? দ্রুত কেন উঠে চলে গেল ? মদ মাথায় নিশ্চয় চড়েছিল আমার, তাই দু:খ পেলাম। আমি গল্প করতে চেয়েছিলাম। পরে দু:খটা চলে গেল, রয়ে গেল এক রহস্যবোধ। আজও আছে।

এক ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে থাকা অভিশপ্ত প্রজন্মের গল্প এই চক্রবর্তী পরিবারের। যদি ভূত-ভগবানে বিশ্বাস করতাম, তাহলে বরং ভাল ছিল। কোনও এক অলৌকিক কার্য-কারণতত্ত্ব বের করে ফেলতে পারতাম। নাস্তিকদের সমস্যা অনেক। সেরকম কিছুও করতে পারছি না, আবার এই ভাঙনের কোনও মানেও হয় না বুঝতে পারছি।

টালা পার্ক অ্যাভিনিউ-এর বাড়িতে উঠে আসার অন্যতম কারণ ছিল আমার বড়দার বিয়ে। তার বয়স তখন একত্রিশ। বৌদির বয়স উনিশ, এগারো ক্লাসের হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করা একটি মেয়ে, ঠিক আমার ছোড়দার বয়সি। কোনও একটা যোগাযোগে এই সম্বন্ধ হয়েছিল। বৌদিদের তরফে বিয়ে হয়েছিল ঢাকুরিয়ার পেট্রল-পাম্প সংলগ্ন বিয়ে বাড়িতে, আর আমাদের দিক থেকে বাগবাজারের এক বাড়িতে। বৌদি এবং ছোড়দা দুজনেই স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হয়েছিল ততদিনে। ছোড়দা অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে আর বৌদি বি-এসসি পাস-এ। বড়দার বিয়ের পরে ছোড়দা আর বৌদি দুজনে সকালে এক সঙ্গে কলেজ যেত। সেটা খুব ভাল লাগত দেখতে।

কিন্তু কিছু রকবাজ ছেলে ওদের আওয়াজ দিত। ওরা গ্রাহ্য করত না কিন্তু আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যেত। উত্তর কলকাতা, ১৯৭৫, বন্ধুগণ, খুবই যৌনতা-নিপীড়িত কুৎসিত জায়গা ছিল। মাত্র তিন বছর পর প্রত্যন্ত দক্ষিণে এসে আমি খুব উল্লসিত হই। এখনও জানি না উত্তর-দক্ষিণ কেন এত আলাদা ছিল ? রাজনৈতিক কারণে কি ? তখন যাদবপুরে থাকলেও কি আমি একই পরিবেশ দেখতাম ? জানি না। তবে বিশেষত মেয়েদের নিয়ে উত্তর কলকাতায় সেসময় আমি অনেক অসভ্যতা হতে দেখেছি। প্রেম-টেম নয়, খুব গোদা মাপের বোকামো। সেক্সচুয়াল রিপ্রেশনের অত্যন্ত নিকৃষ্ট শহুরে প্রকাশ। পাড়ায় পাড়ায় মারামারি হত আকছার। একবার, খেলাৎবাবু লেনে থাকার সময় স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছি। হঠাৎ মলয়দা নামের একটা ওঁচা পুলিশ কোয়ার্টারের ছেলে আমাকে ডেকে বলল, 'এই কুট্টি, শোন'। আমি যথারীতি ভয় পেলাম। ওদের কাজই ছিল নিরীহ মানুষকে উত্যক্ত করা। আমাকে ওরা এক জোড়া চটি দেখিয়ে বলল ছোড়দাকে ওটা দিয়ে দিতে। আমি অবাক হলেও কিছু না বলে বাড়ি এলাম। ছোড়দা তখন একটা ঘর পেয়ে গিয়েছিল ওই বাড়িতে। ওর নিজের ঘর। সেখানে ঢুকে দেখলাম মুখ লাল করে বসে আছে ছোড়দা। একটা বই চোখের সামনে খোল। কিন্তু সেটা পড়ছে না। আমি ঘটনাটা জানালে ও লাল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'রেখে যা'। তখন ও বোধহয় তখনকার এগারো ক্লাসে পড়ে। আমি ফাইভে। একটা রহস্যের গন্ধ পেলাম। কিন্তু জানতে পারলাম না কিছুই।

সেদিন সন্ধেবেলায় পাড়ায় তুলকালাম। ছোড়দার বন্ধুরা -- পলুদা, বাবলুদা এবং দলবল মশাল জ্বালিয়ে চলে এল মলয়-তরুণদের ধরতে। বীরেরা নিমেষে হাওয়া। নির্মলকাকু বলে একজন ফালতু রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন, তিনি নিষ্পত্তি করতে গেলে পলুদা চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'নির্মলদা, বাবুকে ওরা মেরেছে। ওদের আমরা তুলে নিয়ে যাব। না হলে জ্বালিয়ে দেব সব'।

নিশ্চয় ওদের শক্তি অনেক বেশি ছিল, ওরা অনেক বড়লোক ছিল, ওদের অনেক প্রভাব ছিল। একটা রফা হল। তর আগে মলয়দের গোপন জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে বলা হল। ওরা এলে ছোড়দাকে পলুদারা বাধ্য করল ওদের চড়-চাপড় দিতে। নিজেরাও দু-চারটে লাথি-টাতি মেরে নিল। পাড়ায় রাস্তায় ঘটছে ঘটনাটা, তখন সন্ধে, গিজগিজে ভিড় চারদিকে। প্রত্যেক কটা বারান্দায় মহিলারা দাঁড়িয়ে। পুরুষেরা ধুতিকে লুঙ্গির মতো পরে (অফিস থেকে ফিরেই পরে নিত) রাস্তায়। মাঝখানে রণক্ষেত্র ফাঁকা রেখেচে সবাই। হোক, কিছু হোক।

এরপর সব ফাঁকা। ধীরে ধীরে বিজয়ীদের চলে যাওয়া, পরাজিতের অন্ধকারে লুকনো, ছোড়দা বাড়ি চলে গেল বীরের মতো রোঁয়া ফুলিয়ে। কী হয়েছিল জানতে পারলাম না। পরে মনে হয়েছে মলয়-তরুণের দুই সুন্দরী উড়ুক্কু বোনের সঙ্গে এ গল্পটার কোনও যোগাযোগ আছে।

দেখা আর জানার মধ্যে তফাত রয়ে গেল আজতক। রহস্য আর গেল না জীবন থেকে।

পর্ব ১৬

বন্ধুরা, এবার থেকে অনেক সত্যি কথা বলতে পারব না। কারণ যে সময়ের কথা বলছি তখন আমার বয়েস চোদ্দ বছর। আমরা টালা পার্ক এভিনিউর বাড়িতেই বসবাস করছি। বড়দার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, সে তখন কানপুরে পোস্টেড। বৌদি আমাদের সঙ্গে আছে। আমার বাঙালপনা উত্তর কলকাতা, মোহন মাহাতো এবং একটা নিরন্তর তাড়া করে চলা অভাববোধের প্রভাব চ্যাংড়ামোতে পরিণত হয়েছে। মূলস্রোত রেফিউজি থেকে ভাসমান কলকাত্তাইয়া নাগরিক। এখন আর কেউ বাঙাল বলে না। আমার মুখে তাইলে আর ইসে ছাড়া বিশেষ কোনও লক্ষ্মণ নেই পুব পাকিস্তানের। হয়তো দক্ষিণ কলকাতায় থাকলে এমনটা হত না। বহু উদ্বাস্তু জমা হয়েছিল ওসব জায়গায় এবং ছোটখাটো বাঙাল কলোনিতে পরিবৃত থাকলে মুখে-চোখে বাতাবরণে একটা বাঙাল চাল থাকত। ভাষায় এতটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটত না।

অনেক সত্যি কথা বলা সমস্যার হয়ে দাঁড়াচ্ছে ১৯৭৬ সাল থেকে। আমার সম্ভবত কিছু আগে-আসা বয়:সন্ধিকাল এটা। অনেক গন্ডগোল করে ফেলছি। মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা যৌনতার সঙ্গে কোনও আপস করতে পারছি না। আমার সমবয়েসিদের বেশিরভাগই এই দুরবস্থা পেরিয়েছে তখন। সব সময়ই একটা পাপবোধ ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়, বড়দের ক্রমগত চেষ্টা সেই ভয়কে চিরস্থায়ী করার। এইসব চক্করে পড়ে আমরা যখন ১৮-১৯-এ পৌঁছতাম, যতদিনে আশ্চর্য এক অনুভূতির বয়েস পেরিয়ে আসতাম নেহাত ভয়ে, তখন মনে হত, এই তো বেশ লায়েক হয়ে গেছি। আমারও বেশ অধিকার এসে গিয়েছে ১৪-১৫-কে শায়েস্তা করার। এখন আমরা কত বুঝদার হয়েছি। কত বন্ধুত্ব, বিশ্বাস বেড়েছে বড়য়-ছোটয়, প্রজন্ম ব্যবধান ঘুচে গেছে কত বেশি। অথচ তাও যে কেন একটা আঠের বছরের মেয়েকে আত্মহত্যা করতে হয়। এইটুকু বয়েসেই ও কী করে বুঝে গেল যে ওকে মরে যেতে হবে ? এসব ঘটনা শুনলে একটা ডুবে যাওয়ার অনুভূতি হয়। অথচ এত কাউন্সেলিং, বাবা-মার সহানুভূতি, এত মোবাইল মুহূর্ত, এত গান-সিনেমা-হুল্লোড়, এত সুনিয়ন্ত্রিত পড়াশুনো -- ! কিছুতেই বুঝতে পারি না কোনটা ঠিক এদের জন্য। বন্ধুত্ব যে ঠিক তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এত বছর একটা কলেজে পড়াচ্ছি, বুঝতে পারি, বন্ধুত্বের কোনও বিকল্প নেই। কিন্তু শুধু তাতে হয় না। কীসে হয় জানি না। এক ঘোলাটে বিকেলের মতো চিন্তাগুলো আসে যায়। অপরাহ্নবেলা।

যেহেতু আমাদের ছোটবেলা অন্যরকম ছিল, তাছাড়া আমি বখে যাচ্ছিলাম, পড়াশুনোয় বাজে করছিলাম, তাই সে সময়ের কথা বলতে গেলে অনেক অস্বস্তিকর প্রসঙ্গ এসে যাবে। আমার গল্পে জড়িয়ে পড়বে অনেক মানুষ যারা আজ প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে নিয়ে বর্তমান, এসে যাবে পারিবারিক এমন সব প্রসঙ্গ যেগুলো আজ আর না বলাই ভাল। কোনও পুরোনো কালের পচা গল্প দিয়ে হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগিয়ে কী লাভ মামু ? তাই শুধু নিজের গল্পে ঢুকে পড়ি।

এই সময়ের একেবারের প্রথম দিকের ঘটনার নাম হতে পারে, যেদিন পুলিশ ধরেছিল। বড়দার বিয়ের কিছু দিন আগে পুলিশের হাতে ধরা পড়ি বেলগাছিয়ায় -- তখন আমার বেশ কিছু প্রভাবশালী বন্ধু হয়ে গেছে আশপাশে। বয়েসে সবাই বড় দু-তিন বছরের, তাই সরাসরি বড়দের এলাকায় চলে যেতে পারছিলাম। ভয় কম এবার, কারণ বন্ধুরা মোহন মাহাতোর শ্রেণীর নয়। এদের কাছ থেকে টাকা নিলে সুদ চাইত না। টাকা চাইতেই হত না। এরা সচ্ছল বাড়ির ছেলে ছিল, বেশ খাওয়াত-টাওয়াত। একদিন সন্ধেবেলা কে যেন বলল বেলগাছিয়ায় এক দর্জির দোকানে যাওয়ার আছে। আমরা বেশ কয়েক জন হ্যা হ্যা করতে করতে যেমন সবাই যায়, গেলাম। বেশ ভিড় ছিল ফুটপাতে। দর্জির দোকানের দিকে যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি সঙ্গে কেউ নেই। পেছনে পাঁচ সেকেন্ডের একটা কোলাহল। ঘাড় ঘোরাবার আগেই আমার প্যান্টের পেছন দিয়ে ভেতরে হাত গলিয়ে একটা শক্ত হাত প্যান্টের ভেতর দিকটা চেপে ধরল। কিছু বুঝতে না বুঝতেই আমি দেখলাম শক্তিশালী সেই অনবদ্য চেহারা। ছোট করে জুলফিহীন চুল কাটা, আমার থাই সাইজের কবজি, রুক্ষ সেই টোটেম-সদৃশ পুলিশ কর্মী। কেন আমায় ধরেছে বোঝার আগেই আমাকে ঠেলে দেওয়া হল কালো গাড়ির মধ্যে। সেখানে সস্তার যৌনকর্মী, তার আলুথালু মাতাল খদ্দের, এরকম মাঝেমধ্যেই ধরা পড়তে অভ্যস্ত সাট্টার পেন্সিলার, টালা পার্ক থেকে সংগ্রহ করা প্রেমোন্মত্ত যুবক-যুবতী সবাই আছে। বাইরে থাকার সময় ভ্যা করে কাঁদছিলাম, এখন ভয়ে সিঁটিয়ে আছি। অবাঙালি ওই যৌনকর্মী খুব ভাল মুড-এ ছিল, বিচিত্র হিন্দিতে কথা বলছিল এবং এখানে-সেখানে পানের পিক ফেলছিল। আমার গায়েও পড়ছিল সেই পিক। একটা মিটমিটে আলো জ্বলছিল। ভৌতিক সেই আলো যা কিনা আঁধারের অধিক। দত্তবাগান থানায় নিয়ে গেলেন আমাদের পুলিশ কর্মীরা। তখন আতঙ্কে দিশাহারা আমি, মোটেই কাঁদছি না। ভেতরে বসে থাকা পুলিশ কর্মীরা প্রথাগত চড়-চাপড় মারলেন কয়েকজনকে, খিস্তি করলেন কাউকে। সাট্টার পেন্সিলারকে একটু বেশি অবমাননা সহ্য করতে হল দেখলাম। তার পেছনে ক্যাঁৎ করে লাথি মারলেন ছোট অফিসার গোছের এক ভদ্রলোক। এর মধ্যে রাগের চেয়ে হতাশাই বেশি দেখলাম। দুজনে দেখা বড় বেশি হচ্ছিল মনে হয়।

আমাকে দেখে অবাক হল অনেকেই, নিপাট ভদ্রলোকের খোকা, পয়সার ছাপ নেই। ক্লাস সেভেনে পড়ি, ছ-গাছা হালকা লোম নাকের নীচে। অফিসার যে পুলিশ কর্মী

আমায় ধরেছিলেন, তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ তো বাচ্চা। কী করেছে ?' 'পেটি কেস। গায়ে হাত দিয়েছে, স্যার।' বলে তিনি আমার (সম্ভবত কোনও মহিলার) 'গায়ে' হাত দেওয়ার কাল্পনিক ভঙ্গি বিশ্রীভাবে অনুকরণ করে দেখালেন। আমি গলা ফাটিয়ে কেঁদে উঠলাম, 'আমি কিছু করিনি।' অফিসার আমায় চুপ করতে বলে ওই কর্মীকে বললেন, 'কার গায়ে হাত দিয়েছে ? সে কোথায় ?' কর্মী হাসলেন এক অদ্ভুত হাসি। কিছু বললেন না। অফিসার বিরক্ত মুখে বললেন, 'ফালতু কাজ সব।' পাশে বসে থাকা এক করণিককে তিনি আমার বাড়ির ঠিকানা লিখে দিতে বললেন। আমি শুকনো মুখে সব বলতে লাগলাম।

এমারজেন্সির সময় সেটা। পুলিশকে কাজ দেখাতে হত। কোটা ঠিক রাখতে বোধহয় ব্যবহার করা হয়েছিল আমায়। এছাড়া এমনও হতে পারে কেউ সত্যিই কোনও মহিলার সঙ্গে ফোকটে ঘনিষ্ঠ হতে গিয়েছিল। পুলিশ দেখে পালিয়েছে। ভীড়বিভ্রান্ত আমাকে চট করে ধরে নিয়েছে পুলিশ। অপকর্মটা আমার বন্ধুরাও করে থাকতে পারে। যা হোক, বাড়িতে নিশ্চয় খবর দেওয়ার ব্যবস্থা হল। আমি একই সঙ্গে আশ্বস্তি এবং ভয়ের দোলাচলে ছিলাম। ভয় এই কারণে যে ছোড়দার ক্রোধ ছিল চন্ডালের মতো। বকলমে সেই যখন আমার অভিভাবক, তখন সে যে আমায় বেধড়ক পেটাবে বাড়ি গিয়ে, এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে এল কুট্টিদাদু আর ছোড়দা। দৃশ্যটা একদিক থেকে দেখলে হাসির। কারণ কুট্টিদাদু ব্রিটিশ আমলে কিছুদিন অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিল।গ্রাম উন্নয়নের কাজ করেছে। তাকে আসতে হল 'পেটি কেস' খাওয়া নাতিকে ছাড়াতে। তবে এই হাসির মধ্যে কিছুটা আয়রনিও মিশে আছে। আজ মনে হয় অন্তত আমার জীবনের বেশিরভাগ হাসিই এমন আয়রনিক। যে হাসি আমি হেসেছি এবং যে হাসি অন্যরা আমায় নিয়ে হেসেছে বেশিরভাগই মুক্ত হাসি নয়।

আমাকে ছেড়ে দেওয়া হল। সে রাতে বাড়ি ফিরে ছোড়দা দা নিয়ে আমায় তাড়া করেছিল। আজ যে আমি বেঁচে আছি তার একটা কারণ মায়ের হস্তক্ষেপ এবং ছোড়দার চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব।

মনের ভেতরটাকে যে কে বাঁচায় কে জানে। এত বখামো সত্ত্বেও বই পড়ার ঝোঁক থেকে গিয়েছিল। বাজে পরিবেশ, বাজে সঙ্গী, বাড়ির অবহেলা -- এর মধ্যেও কিছু একটা যেন বাঁচিয়ে রেখেছিল আমাকে। অনবদ্য আকর্ষণ ছিল বিশ্বদার রাজেশ খান্না অনুগত ভঙ্গি পানে। রকে তুমুল আলোচনা চলত হিন্দি সিনেমা এবং গানের। অমিতাভ বচ্চন তখন আনন্দ এবং নমকহারাম-এর জন্য নজর কাড়তে আরম্ভ করেছেন, কিন্তু তবে রাজেশের বিপরীত হিসেবে। তখনও দেওয়াল ফেটে বেরিয়ে আসেননি তিনি। এটা শোলের অনতিপূর্ব কালের কথা। বিশ্বদা মণীন্দ্র কলেজের গবা

ছাত্র ছিল। তার হাবভাব, সন্ধেবেলা চোস্ত-সাদা পাঞ্জাবি পরে রকে আসার কায়দা, রাজেশ খান্নার মতো করে ভ্রু তুলে কথা বলা, সবই যে আর এক গবা ছাত্র মুগ্ধ হয়ে লক্ষ করছে, তা নিশ্চয় জানত সে। তবে এই বিশ্বদার সঙ্গেও আমার যোগাযোগ গন্ডগোলের। আমার মুগ্ধতা সত্ত্বেও বিশ্বদা আমাকে বেইজ্জত করতে ছাড়েনি। এবং এবারও আমাকে বাঁচাতে অবতীর্ণ হয়েছিল পল্টুদা।

টালা পার্ক এভিনিউর যে বাড়িতে আমরা থাকতাম, সেখানে আগে থাকতেন আমাদের কিছু একটা সূত্রে আত্মীয় এক পরিবার। দুই বৃদ্ধ ভাই, তাঁদের জোড়া স্ত্রী এবং বড় ভাইয়ের ছেলে। এই ছেলের বিয়ে হওয়ার পরে তাঁরা দুর্গাপুরে চলে যান। এঁরা থাকাকালীন বড় বৃদ্ধের বড় মেয়ে তার দুই কিশোরী কন্যাকে নিয়ে বেড়াতে আসেন এখানে। এই দুই মেয়ে আমার গোপাদি এবং পুনুদি অত্যন্ত আগ্রহের সৃষ্টি করে এই অঞ্চলে। কারণ এদের মতো পোশাক পরা ইংরেজি বলা বাঙালি মেয়ে আমরা অপর্ণা সেন ছাড়া কাউকে দেখিনি। তাঁকেও দেখেছি সিনেমায়। বাস্তবে স্কার্ট, ম্যাক্সি পরা, সপ্রতিভ মেয়ে দেখে আমাদের কালচার শক হয়। ছোড়দা অবশ্য স্মার্ট মানুষ। ভাল পোশাক পরে অন্যমনস্ক হয়ে বিকেলের দিকে এমন এক মোক্ষম সময়ে ওই বাড়ির পাশ দিয়ে হালকা করে হেঁটে বেড়াত যে গোপাদি, পুনুদি এবং সদ্য বিবাহিত তপনকাকুর (বড় বৃদ্ধের ছেলে) স্ত্রী ওকে ডাকত। এইভাবে ওদের আড্ডা শুরু হত এবং চলত। আমার বয়েসি ছেলেকে ওই সময়ের মেয়েরা কুঁচো চিংড়ি মনে করে। কিন্তু তা বলে আমার মনের বেদন তো থেমে থাকে না। আমিও সময়মতো ওই বাড়ির পাশে ঘুরপাক খাই। এরকম এক বিকেলে বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন আমি কোনও ভাঁড়ামোতে ওদের মুগ্ধ করছিলাম, তখন বিশ্বদারাও বড়দের কোনও ভাঁড়ামো করতে করতে, মানে রাস্তায় বোকা ছেলেরা যেমন করে তেমনি, গোপাদিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য লড়ছিল। বিশ্বদা মাত্রা হারিয়ে হঠাৎ আমার দিকে দৌড়ে আসে এবং রাস্তার চ্যাংড়ার ভঙ্গিতে আমার কোমরে একটা লাথি মারে যেন আমি একটা ফুটবল। আমার খুব ব্যথা লাগে। আমি অপমানিত হই ওই তিন সুন্দরী মহিলার সামনে এভাবে অপদস্থ হয়ে। এবং নেহাতই অকারণে আমাকে মারায়। এত কষ্ট হয় আমার ! আজ পর্যন্ত আমি তেমন সব মানুষদের ঘেন্না করি যারা দুর্বলকে অকারণে মারে, উন্মাদকে টিজ করে, শিশুদের উত্যক্ত করে, রাস্তার কুকুরদের লাথি মারে। ছোড়দা ছিল না সেদিন। কাকিমা এবং দিদিরা হাঁ হাঁ করে ওঠায় বিশ্বদা বোঝে ওর খেলাটা ভুল হয়ে গেল। আমাকে ডাকতে লাগল দূর থেকে। কিন্তু আমি ততক্ষণে ট্যাঙ্কের ওপর দেখতে পেয়েছি আমার আবছা পল্টুদাকে। আমি প্রাণপণে দৌড়োতে থাকি সেই দিকে।

বোধহয় পল্টুদাও আমাকে দৌড়োতে দেখেছিল। ওই থেমে গেল। আমি ঢোঁক খাওয়া গলায় কান্না সামলে ওকে বললাম সব আবার কেঁদেও ফেললাম। পল্টুদা হুড় হুড় করে লোহার গেট বেয়ে এপারে নেমে এল। আমার হাত ধরে বলল, 'আয় তো।' এত দ্রুত

দৌড়োতে পারে কোনও মানুষ আমি জানতাম না। বিশ্ব শুকনো মুখে গুলতানি মারছিল ভেঙে যাওয়া ঠেক-এ। পালানোর আগেই তাকে ধর্মেন্দ্রর মতো মারকুট্টে ভঙ্গিতে ধরে ফেলল পল্টুদা। আমার বুক ভরে গেল যখন দেখলাম বেধড়ক বিশ্বকে মারল পল্টুদা -- আমার দুই দিদি এবং কাকিমার সামনেই। এরপর পল্টুদা আমাকে এক ভয়ঙ্কর প্রস্তাব দিল। নড়া ধরে রাখা বিশ্বর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'মার সালার বাচ্চাকে'। আমি পারলাম না। পল্টুদা বলল, 'কী হল ? মার !' আমি পারলাম না। ততক্ষণে লোক জমে গেছে। যার আশপাশ থেকে আমার দিদিদের, কাকিমাকে অবলোকন করছিল, তারা নেমে এল প্রকাশ্য রাস্তায় সবচেয়ে সহজ কাজ করতে মধ্যবিত্তদের সব চেয়ে প্রিয় বিনোদন -- মধ্যস্ততা। তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে পল্টুদা বিশ্বকে বলে যেতে লাগল, 'এ আমার ভাই আছে রে কুত্তার বাচ্চা। কোনও দিন দেখি ওর -- লেগেছিস, তো আমি তোর -- হুড়ো দিয়ে ছেড়ে দেব --' এ জাতীয় অনেক কিছু বলে আমাকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল পল্টুদা।

পল্টুদা সমাজবিরোধী, মনীন্দ্র কলেজে পড়েনি, মধ্যবিত্ত 'ভদ্র' বাড়ির বখা ছেলে নয়। আজ আমার মনে হয় কোনও এক জায়গায় আমার সঙ্গে নিজের মিল খুঁজে পেয়েছিল ও। হয়তো কোনও এক ছিন্নমূলতায়। ওকে হয়তো সাহায্য করার কেউ ছিল না যখন ও নিজে মার খেয়েছিল, খেত, কঠোরতর বিশ্বদের কাছে। সেটা ভোলেনি পল্টুদা। আমার বাবা মারা গিয়েছিল বলে ও নিজেই যেন দায়িত্ব নিয়েছিল আমার পরিত্রাতার ভূমিকায় কাজ করার।

অনেক বিকেল আমি কাটিয়েছিলাম পল্টুদার সঙ্গে, এর আগে এবং পরে। তারপর কোনও একটা সময়, বোধ হয় আমার কানপুর যাওয়ার আগে থেকেই পল্টুদা হারিয়ে গেল।

পর্ব ১৭

শ্যামবাজার হাইস্কুলে পড়ার সবচেয়ে সুবিধে ছিল সিনেমা হলগুলো কাছে চলে আসা। স্কুল কেটে সিনেমা দেখা, খুব নিয়মিত, একটা সাংস্কৃতিক কাজে বদলে গেল। কলকাতায় এখন দেখা যায় এক শ্রেণীর মানুষের একটা কালচার বাজেট থাকে। প্রধানত শীতকালীন সুস্থ সংস্কৃতির বাজেট, যাতে বিভিন্ন মেলা, যেমন ধরুন, বইমেলা, পোড়া মাটির গয়নার মেলা, সিনেমা মেলা -- মানে উৎসব, শিল্প মেলা, খাদ্য মেলা, নাট্য মেলা এসব পড়ে। নন্দনের মুখে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে বিতৃষ্ণ মুখে একজন বলছেন, অ্যান্টার্টিকার কোনও ছবি নেই। ইল্লেচোর রেট্রসপেক্টিভ কবে আসবে বলবেন ? কী হচ্ছে এসব। বইমেলায় তিনি বা তাঁর গম্ভীর

ভদ্র বন্ধু বলবেন, ভর্তি মাছভাজা, বই কোথায় ? বই ? খ্রুশ্‌ট-এর অটোবায়োগ্রাফি নেই, প্যারাসাইন্সের ওপর স্যামুয়েল তক্তার ইন দ্য মেজ অব অটো-বাইনারিজ নেই। এটা মেলা।

আমারও কালচার বাজেট ছিল। অর্থাৎ কুপথে উপার্জন হলে কী কী সিনেমা দেখব সারা মাস, তার একটা হিসাব রাখতে হত। পছন্দ ছিল বাজেট-সাপেক্ষ। একবার মনে আছে স্কুল কেটে আর কিছু দেখার পয়সা ছিল না বলে তখনই বেশ পুরোনো রাজ কাপুরের দিওয়ানা দেখেছিলাম নির্জন উত্তরায়। ৭৫ পয়সার খাঁচার সুপারভাইজার দশ পয়সা কমে আমায় ঢুকতে দিয়েছিলেন, কারণ সেদিন ওই হলে বোধহয় আমি ছাড়া আর কেউ সিনেমা দেখতে যায়নি।

রিঙ্কুদা নামের আর এক মহাপুরুষ নেমে এসেছিল আমার জীবনে। পড়াশুনোয় খুব তুখোড় একটা ছেলে, একটা সংস্কৃতির ছাপ ছিল তার ব্যক্তিত্বে। কী করে ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল জানি না। ও প্রায় যেচেই আমাকে পড়ানোর প্রস্তাব দেয়। ওর উদ্দেশ্য টাকা উপার্জন ছিল না। কারণ ওদের বাড়িতে সপ্তাহে দুদিন যে জলখাবার আমাকে দেওয়া হত এবং যা আমি গোগ্রাসে খেতাম তার খরচ মাসে দশ টাকার বেশি-ই ছিল। কিন্তু আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল উপার্জন। বাড়ি থেকে আমি পনের টাকা নিতাম এই কারণে যাতে পাঁচ টাকা ঝাপতে পারি। মানে ভদ্র সিট-এ দুটো সিনেমা, রাহা খরচা নিয়ে ভাবতাম না।

ভাল পড়াচ্ছিল রিঙ্কুদা। বেশ চটপট অঙ্ক শিখে উঠছিলাম। ইংরেজি শেখাচ্ছিল সুন্দরভাবে। ক্লাস সেভেন-এর হাফ ইয়ারলি-তে স্কুলকে চমকে দিয়েছিলাম, কাকু খুশি হয়েছিল। বাড়িতে নেমে এসেছিল একটা সন্দেশ-খাওয়া পরিবেশ। সবাই অল্প খুশি। কিন্তু আমার মন মানে না। আবার কখনও মোহন, কখনও মদন-সুমিত-চন্দন আর প্রেম। হ্যাঁ প্রেম। রিঙ্কুদার কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। ওই রাস্তায় হাঁটাই। কারণ ওর মুখোমুখি হওয়ার মতো সাহসও ছিল না। তাছাড়া বাঙাল প্রেমে পড়েছে পুন্যির। মদনের বোন পুন্যি, কোন একটা স্কুলে যেন ক্লাস এইটে পড়ে। আমি প্রচন্ড প্যাশনেটলি তার প্রেমে পড়ে গেলাম। আকাশ-বাতাস উত্তাল হল এই প্রেমে, মৃদু বসন্ত-সমীর বইল আমার প্রেমের ব্যাকগ্রাউন্ডে স্কোর হিসেবে। পুন্যি সম্ভবত ব্যাপারটায় আনন্দ পাচ্ছিল, যেভাবে লোকে ভাঁড়ামো দেখলে মজা পায়। ওই বয়েসি একটা মেয়ে নিদেনপক্ষে একটা ১৮-১৯ বছরের ছেলে খোঁজে। তার ওপর আমি এইটে উঠব, ও নাইনে। তার ওপর আমি বেদম গরিব, অপদার্থ। তবে পুন্যি তখন প্রথম যৌবনের নিয়মগুলো মেনে চলছে, নারী হওয়ার মাধুর্য শিখছে দিদি-বৌদি-হেমামালিনীর কাছে। সে খুব হাসত, আমি হাসতাম আর হাসত, ইনশাল্লা, অদৃষ্ট। ক্লাস সেভেন থেকে এইট উঠে গেলাম রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের অভিযানের মতো। দেখা গেল, খুব খুবই মৃদুভাবে পাশ করে গেছি। কিছুদিন বাদেই এল বড়দা। সিদ্ধান্ত

নেওয়া হল দুই সংসার চালাতে তার খুব আর্থিক অসুবিধা হচ্ছে। দাদা-বৌদি-মা আমি সবাই যাব কানপুরে। ছোড়দা থাকবে কলকাতায় পড়াশোনা করতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে। আমি কানপুরের কোনও স্কুলে ঠিক ভর্তি হয়ে যাব। বোধহয় মে মাস ছিল ওটা, সাল ১৯৭৬। আমি আমার ক্লাস এইটে ওঠার দীর্ণ রেজাল্ট নিয়ে বাকি তিনজনের সঙ্গে হাওড়া গিয়ে তুফান মেল-এ চাপলাম। ছোড়দা ছাড়তে এসেছিল। ট্রেন ছাড়ল। গন্তব্য কানপুর।

এখন থেকে ভূদৃশ্য বদলাতে লাগল। ১৯৭১-এর পরে এই দ্বিতীয় বেরোনো। বর্ধমানে কারা যেন খাবার নিয়ে গেল। কোনও বৈবাহিক আত্মীয় হবে বড়দার। দুর্গাপুরে খাবার দিয়ে গেল সেই তপনকাকুরা, যারা যাওয়ার পরে আমরা টালা পার্ক অ্যাভিনিউর বাড়িতে ঢুকেছিলাম। পুরো রেলপথ জুড়ে প্রায় ঘুমোচ্ছিলাম আমি আর মাঝে-মধ্যে উঠে আকণ্ঠ খাচ্ছিলাম। শেষ দুপুরে ঘুম ভাঙল। তখন ট্রেন পেরিয়ে যাচ্ছে বিহার। সারা ট্রেনের লোক ঘুমোচ্ছে আর আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখে যাচ্ছি বদলে যাওয়া দৃশ্যপট। এই প্রথম পাহাড় দেখা, আসলে বিহারের টিলা, কিন্তু আমার চোখে প্রথম পাহাড়। শুকনো ধূসর পাথরের সারি। তার ওপর গনগনে রোদ। সেরকম একটা টিলা ধরে কারা যেন চলে যাচ্ছিল দূরে। অদ্ভুত মোহময় দৃশ্য। একটু পরেই দেখলাম স্টেশনের নাম, ঝাঝা। ভাবলাম, এখানে আমি একদিন ঠিক আসব। পুন্যির কথা মনে পড়ছিল একটু একটু। কত দূরে রেখে এসেছি সব। কিন্তু আবার তো ফিরে যাব, আবার দেখা হবে, আচ্ছা-পুন্যি কি আমার কথা ভাবছে? এবার যখন ফিরব তখন নিশ্চয় গভীর প্রেম হবে ওর সঙ্গে। ফটাফট সিনেমার দৃশ্যের সঙ্গে সেই প্রেমের সুপারইমপোজ করা দৃশ্য মিশে গেল। বিহারের ঘোর জাগানো মানচিত্র আবার তার দিকে ডেকে নিল আমাকে।

এক ঘোর জাগানো সময় পার হয়ে গেলাম ধীরে ধীরে। উল্টোদিকের বার্থ-এ চোখ গেল হঠাৎ। এক তরুণ স্বামী-স্ত্রী শুয়ে আছে ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে। হয়তো ওরা একটাই বার্থ পেয়েছিল। কিংবা হয়তো এটাই ভাল লাগছে ওদের। ঘর বাঁধতে চলেছে কোথাও। এই সময়টা বড় সুন্দর, তাই দৃশ্যটাও। মনে পড়ল পূর্ব পাকিস্তানে থাকতে এক সকালে ঘুম থেকে উঠে দিদি আর জামাইবাবুকে এভাবেই জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকতে দেখেছিলাম বেড়ার ফাঁক দিয়ে। এই রহস্যের কথা কাকে বলা যায় ভাবতে ভাবতে দেখা হয়েছিল রমণীর সঙ্গে। জামাইবাবু যখনই আসত গোপালগঞ্জ থেকে কোনও না কোনও শাগরেদ নিয়ে আসত। মুজাফফরের পরে আসত রমণী নামের কালো গোলগাল একটা লোক। এত বড় গাড়োল ছিলাম আমি যে রমণীকে এ কথাও বলে ফেললাম দিদি কিচ্ছু না-পরে শুয়ে ছিল জামাইবাবুর সঙ্গে। রমণী এ কথা নিশ্চয় জামাইবাবুকে জানিয়ে থাকবে। দিদিকে পরের দিন কঠোর চোখে তাকিয়ে থাকতে

দেখেছিলাম আমার দিকে। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল নিশ্চয়। একটু বেচাল কথা বললেই ঠাঁটিয়ে মেরে দিত।

রাতের দিকে এল পাটনা। এবার খেলাম ট্রেনের খাবার চারজনে গল্প করতে করতে। খাওয়া শেষ হতে না হতেই ঘুম। আর সেই ঘুমে কী আশ্চর্য নেমে এল আমার শৈশবের সমতলভূমি। কী করে যেন নৌকোর দুলুনির সঙ্গে মিলে গেল ট্রেনের দে-দোল দোল। আমি তখনও জানি না এই রাতের পর থেকেই জীবন বদলে যাবে। অন্য একটা জীবনে ঢুকব বহু দিনের মতো। কানপুর, বলা যেতে পারে, আমার রেফিউজি লাইনের একটা চরম অধ্যায়।

সকালে এলাহাবাদ পেরিয়ে কানপুর। সেখান থেকে রিকশা চেপে শান্তিনগর। রাস্তাঘাটের কিচ্ছু মনে নেই। শুধু মনে আছে দুটো রেলওয়ে ক্রসিং ছিল, একটা লখনউ লাইন, অন্যটা বম্বে (এটা প্রাক-মুম্বই পর্ব) লাইন। বেশ খানিকটা রাস্তা পেরিয়ে আমরা ঢুকি পাষাণ ভবনে। লম্বা একটা খোপ খোপ ফ্ল্যাট মতো বাড়ি। তারই একটা খোপে থাকব আমরা। ঢুকেই একটা লম্বা প্যাসেজ চলে গেছে বেডরুমের দিকে। এই প্যাসেজ-এর জানলার ধার ঘেঁষে দুটো খাটিয়ায় মা আর আমি জায়গা করে নিলাম। ভেতরের ঘরে দাদা-বৌদি। একটা রান্নাঘর, দু-রকম কাজের জন্য দুটো 'বাথরুম' -- এইসব মিলিয়ে আমাদের সংসার। প্রথম দিন মণিলালজির বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল সৌজন্যমূলক। ভদ্রলোকের অনেকগুলো ছেলে। দু-একজন আমার সমবয়েসি। কিন্তু বন্ধুত্ব হয়নি এ কারণে যে আমি কাজ চালানোর মতো হিন্দিতে ওদের সঙ্গে কথা বলতাম। আর ওরা কাজ না চালানোর মতো ইংরেজিতে আমার সঙ্গে কথা বলত। অর্থাৎ এপারে কেকা যখন মুখর তখন অন্যপারে কুহু কাঁপছে। কোনও কারণে ওদের মনে হত কলকাতার লোকেরা ভাল ইংরেজি বলতে পারে। আমি মনোহর অ্যাকাডেমি, শ্যামবাজার হাইস্কুলের দিনগুলোর কথা, মোহন-গুরুপদদের সঙ্গে বড় হওয়ার কথা ওদের বলতে পারিনি। তাই বরাবরই ঋতুর দু-ধারে থেকে গেলাম আমরা। বরাবর মানে দশ মাস। আমার কানপুরী জীবন।

প্রথম কথা যেটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া ভাল তা হল এই যে এই দশ মাস আমি কোনও প্রথাগত স্কুলে পড়িনি। যে স্কুলেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখানে দু-তিন ক্লাস নিচুতে ভর্তি হতে বলা হত। কোত্থেকে দু-চারটে ইংরেজি আর অঙ্ক বই জোগাড় করা হয়েছিল। কিছুদিন দাদা পড়াবার উদ্যোগ নিয়েছিল। আমার উদ্যোগ ছিল না কিছুতেই। তাই এক ভবিষ্যৎহীন হীন বায়বীয় অবস্থায় বিরাজমান ছিলাম। অলস মাথা বিবিধ ভারতী আর ফ্যান্টাসিতে ডুবে থাকত। ওই প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে যাচ্ছি পূর্ব নিবেদনমতো।

কীভাবে টাকা জোগাড় হত জানি না, কিন্তু দু-চারটে সিনেমা দেখেছিলাম কানপুরে।

একটা রাজেশ খান্না (গুরু ! ! !) অভিনীত 'মেহবুবা'। বাকি দুটোও ওরকমই খাজা কিন্তু তখন উল্লসিত হয়েছিলাম। কলকাতায় শেষ হচ্ছিলাম রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আর এখানে বাড়িতে বসে। ছাদে উঠে বিকেলে মেয়ে দেখা, দু:সাহসিক যৌন কল্পনা করা, বই পড়া (বুদ্ধদেব বসু, সমরেশ বসু এবং আরও)। বাইরে দেখলে মনে হবে কী রুচিবোধ ওইটুকু ছেলের। কিন্তু ওরই মাঝে-মধ্যে ঘাপলা ছিল। সমরেশ বসুর 'আমার আয়নায় মুখ' পড়ে শিহরিত আমি। বইটা দেওয়ার সময় বয়স্ক লাইব্রেরিয়ান একবার চোখ তুলে আমায় মেপেছিলেন। কিছু বলেননি। বড়দা ঘটনাচক্রে পড়ে ফেলেছিল বইটা এবং স্পষ্ট বলেছিল, তুমি এ জাতীয় বই এখন পড়বে না। মহৎ সাহিত্যিকের কীর্তি দিয়ে আর টুপি পরানো যায়নি সমাজকে।

কানপুরের মল রোডের ওই বড় বাংলা লাইব্রেরির কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। ওখানেও প্রচুর বই পড়েছিলাম। সবই দুষ্টু বই নয় কিন্তু। কিন্তু যে কারণে ওই লাইব্রেরি আরও স্মরণীয় তা হল জীবনে প্রথম আমি একাধিক হোমোসেক্সচুয়ালের আক্রমণের সম্মুখীন হই। রাজনৈতিকভাবে এই মন্তব্য সঠিক কিনা আমি জানতে চাই না, গ্রাহ্য করি না। কারণ আইনের দিক থেকে ওই সব আক্রমণ মলেস্টেশন-এর সমগোত্রীয়। এখন বুঝতে পারি আমার তখন সমকামী মনোমুগ্ধকর চেহারা ছিল। বড় চুল রেখেছিলাম। দুপুরে ঘুমোতাম। যৌনতা ছাড়া কিছুই ছিল না চিন্তায়। হয়তো আমার ওই মনোমোহন রূপে প্রথম পদক্ষেপ নেয় অতুল বলে একটি ক্লাস নাইনের ছেলে। তার সঙ্গে লাইব্রেরিতেই প্রথম আলাপ আমার। স্বাভাবিকভাবেই তার উদ্যোগে। সুন্দর বন্ধুত্ব হয়। ওর পয়সায় সিগারেট, ফুচকা খাওয়া ভাল লাগে, সিনেমা দেখার পরিকল্পনা চলতে থাকে। আমাকে প্রায় রোজই ওর সাইকেলে করে এগিয়ে দিত অতুল। তাকে আমার এখনও মনে পড়ে। লম্বা কালো একটি মৃদুভাষী ছেলে। একদিন সে আমাকে বাড়ি ফেরার পথে একটা পার্কের পাশে দাঁড় করায়। আমার একটা হাত চেপে ধরে এবং আমাকে চুমো খেতে চায় অর্থাৎ আমি একটা মেয়ের সঙ্গে ঠিক যা যা করতে পারতাম, তাই। এতে আমি সন্ত্রস্ত এবং অপমানিত বোধ করি। অতুল তখন চূড়ান্ত প্রস্তাব দেয়। শুধু একদিন, একবার।

আমি পালাই। ঊর্দ্ধশ্বাসে, মনমোহনের হাতে রেপ হতে চলা অরুণা ইরাণির ব্যগ্রতায়। আমাকে বাঁচানোর মতো কোনও সালা ধর্মেন্দ্র নেই। তাছাড়া গা ঘিন ঘিন করছিল। একটা ছেলে আমাকে ওভাবে ...। বাড়ি ফিরে স্নান করেছিলাম অনেকক্ষণ ধরে। সেই প্রথম আক্রমণ। শেষ নয়।

পর্ব ১৮

দ্বিতীয় আক্রমণ হয় কিছুদিন পরে। ওই লাইব্রেরিতেই। বেশ কিছুদিন বাদে ওখানে গিয়ে আমি অতুলকে আর দেখতে পাই না। এবার আলাপ হয় ক্লাস টেন-এ পড়া আর একটি ছেলের সঙ্গে যার নাম আমার মনে পড়ছে না। একটু বড় বয়েসি ছেলেদের প্রতি মোহ ছিল নিজে বখা ছিলাম বলে। কিন্তু কানপুরের মতো কিশোর-সমকামী তখন কলকাতায় নিশ্চয় খুব খুব কম ছিল। আমি এত লোকের সঙ্গে মিশে একজনকেও দেখিনি। আমার দ্বিতীয় আক্রমণকারী প্রেমিককে খুব অল্প সময়েই বুঝতে পারি এবং ব্যাপারটা নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করি। তাকে বোঝাই যে সে ঠিক আমার সঙ্গে যা যা করতে চাইছে, আমি সেসবই করতে চাই কোনও মেয়ের সঙ্গে। এই খবরে সে বেশ ক্ষুণ্ন হয় এবং অভিমানী প্রেমিকের মতো সেও লাইব্রেরিতে আসা বন্ধ করে দেয়, আজ আমার এটা ভেবে অদ্ভুত লাগে যে সে সময়ের বিপন্ন সমকামী সমাজে নেটওয়ার্কিং খুবই খারাপ ছিল। না হলে দুটো ছেলেই এক ভুল করল কেন ?

এরপর আমি চুল ছোট করে কাটি এবং আমার আপাত-শান্ত মুখে-চোখে পৌরুষ আনার চেষ্টা করি। লাইব্রেরিতে যাওয়াই বন্ধ করে দিই কিছুদিন পরে।

ওখানকার প্রবাসী বাঙালিদেরও সঙ্গে আলাপ হয় দাদার সূত্রে। কোনও মধুর স্মৃতি নেই সেসবের। একটি টিকটিকে চেহারার এনিমিক মেয়ের বাড়িতে গিয়ে ভাল লাগে। আমারই বয়েসি মেয়েটি তার কনভেন্ট স্কুলে পড়া উচ্চারণে আমাকে একটা পাতি ইংরেজি ধাঁধা জিগ্যেস করে। প্রশ্নটাই বুঝতে না পেরে আমি হাসি। আমার দুর্দশায় হাসেন অন্তর্যামী। এভাবে দশ মাস কেটে যায়।

এরপর মার উদ্যোগে আমাদের দুজনের কলকাতায়, ভুল বললাম, পশ্চিমবঙ্গে ফেরা। মা বুঝতে পেরেছিল কানপুরে থাকলে আমার পড়াশুনো আর হবে না। কিন্তু যাব কোথায় ? উঠব কোনখানে ? কে দায়িত্ব নেবে এই মা-ছেলের ? বাজেট খুব কম।

ব্যবস্থা হল আমাদের সেই ছোটবেলার মধু মাস্টারের উদ্যোগে। কীভাবে হল জানি না। মা হয়তো চিঠি লিখেছিল। কিন্তু পুব পাকিস্তানের সেই অনাত্মীয় মধুসূদন পাল আমাদের সাহায্য করলেন তাঁর ভাই-এর বাড়িতে নিখরচায় থাকতে দিয়ে। কল্যাণী যাওয়ার পথে বড় জাগুলি বলে একটা জায়গায়। সেখানে তাঁর ভাই রবি পালের বাড়িতে মধু মাস্টারের একটা ঘর ছিল। মাটির ঘর। সেখানে বসবাস শুরু করি আমরা। মনে হয় ১৯৭৭ সেটা। ওখানেও আমার স্কুলে পড়ার উদ্যোগ শুরু হয়। গল্পটা একই রকম -- কানপুরের মতো। ওখানকার স্কুলে আমার ক্লাস সেভেনে

পড়ার সুরাহা হয়। আমি রাজি হই না। আমার তখন নাইনে পড়ার কথা। আমার কান্না পায়। এই প্রথম। কিন্তু চিকেন পক্স হয় তার সঙ্গে সঙ্গেই। দীর্ঘদিন অসুখে ভুগতে ভুগতে মাঝেমধ্যে দেখি ছোড়দাকে। বড় চুল লম্বা জুলফি গোঁফহীন মুখ নিয়ে আমার যুবক ছোড়দা মাঝে-মধ্যে আসে। কিছুক্ষণ থাকে। চলে যায়। পেয়িং গেস্ট-এর পাট চুকেছে তার ততদিনে।

একদিন আমার অসুখ সারে। আমি বেড়াতে যাই পুরোনো পাড়ায়। সুমিত, মদনের বাড়িতে সুন্দর দিন কাটে একটা। দুপুরে খাই সুমিতদের বাড়ি। খাসা খাবার। নানান রকমের মাছ ইত্যাদি। ডিমের ঝোল আর ভাত খাওয়ার নিত্যকার রুটিন থেকে একটা মধুর ঝটকা। কলকাতায় ফিরতেই হবে আমাকে। কল্যাণী এক্সপ্রেস বাসে ফিরতে ফিরতে আমি সিদ্ধান্ত নিই। কলকাতায় ফিরতে হবে।

এক আত্মীয়ার উদ্যোগে যাদবপুরের কাছে একটা ছিমছাম পাড়ায় একটা বাথরুম সাইজের ঘরে চলে আসি আমরা। একটা খাট কেনা হয়। কিলবিলে ভাড়াটে চারদিকে। একটা বাথরুম। আমরা মা-ছেলে খুব নিশ্চিন্তে এই দরিদ্র সংসারে সুখে দিন কাটাতে আরম্ভ করি। আমি বরাবর আমার নিজের কলকাতায় ফেরার তাগিদের কথাই ভেবেছি। এবা দেখলাম মাও ছিল মনে মনে আমার সঙ্গী। কানপুরের দিনগুলো, বন্ধুহীন, ভাষাহীন, একটেরে অন্ধকার ঘরে কাটানো ওইসব দিন মাকেও তার মানে আচ্ছন্ন করে রাখত। নতুন পাড়ায় এসে আমরা সুখে ছিলাম, ওই যে বললাম, টাকা-পয়সার টানাটানি সত্ত্বেও।

এরপর শিক্ষা-দীক্ষা। তখন ক্লাস নাইনের সেশন শুরু হয়ে গিয়েছে। কাকুর কাছে গিয়ে হাজির হলাম শ্যামবাজার হাই স্কুলে। ব্যাপারটা আগে জানানো ছিল। কাকু শুধু বলল, ক্লাস এইটে তো একমাসও পড়িসনি, পারবি তো? আমি বললাম, পারব।

আমাকে পারতেই হত। অন্য কোনও রাস্তা খোলা ছিল না।

এসব সময়ে অর্থাৎ ১৯৭৭-৭৮-এ সদ্যোজাত স্বাধীন রাষ্ট্র। যোগাযোগ ক্রমে আসছিল দ্রুত পুবের সঙ্গে। মাঝে-মধ্যে গরমের দুপুরে জোর হাওয়া বইলে ছোটবেলার আমবাগানের কথা মনে পড়ত। বাবার কথা মনে পড়ত চূড়ান্ত দারিদ্রের মধ্যে। কিন্তু তা কেবল স্বার্থপরের মতো। মনে পড়ত এক বড়লোক বাবার ফিরে আসার কথা।

ভাগ্যিস আমার বেচারা বাবা সত্যিই মরে গিয়েছিল। আমি দান্দার পতন দেখেছি। দুর্ব্যবহার করেছি তার সঙ্গে। হয়তো বাবার সঙ্গেও করতাম। আর তাহলে আজ দমকা ডিপ্রেশনে ভুগতে হত। সব দুর্ব্যবহারের জন্য আজ সবার কাছে, জীবিত কি মৃত, মাফ চাইতে ইচ্ছে করে। জানুয়ারি মাসের চোদ্দ তারিখ আজ, ২০০৭ সাল। কমাস

পরে পঁয়তাল্লিশে পা দেব। আজ সকাল থেকে ঠান্ডা বিদায়ী শীতবাতাস বইছে। আকাশ ধূসর। গলায় চাদরের খুঁট বেঁধে এখনও এক শিশু দাঁড়িয়ে আছে দক্ষিণের বারান্দায়। মুখ থেকে হা হা করে ছাড়ছে বাতাস, যা পরিণত হচ্ছে ধোঁয়ায়। ক্রমশ সেই ধোঁয়া ছেয়ে ফেলছে এই দীর্ঘ অর্থহীন বেঁচে থাকা। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

বাবাকে ঠিক কারা খুন করেছিল, কীভাবে এবং কেন -- এর কোনও কারণ আমার জানা নেই। বাবার চেয়ে অনেক বড় মাপের সামন্ত-প্রধানের ওই হাল হয়নি। হয়তো বাবার শত্রু বা হত্যাকারী সঠিক কারণ বলতে পারবে। তার দিক থেকে সঠিক কোনও কারণ। আমি যতদূর শুনেছি যে রাতে বাবা দেওভোগ ছেড়ে চলে যায় দান্দার আপত্তি সত্ত্বেও, যে রাতে পরেশ পোদ্দারের বাড়ির আঙিনায় জলের মধ্যে দিয়ে নৌকো চলে যাওয়ার ছপ-ছপ শুনতে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি, সে রাতেই বাবাকে গুলি করা হয়। কোনও কারণে গ্রামে ফিরেছিল বাবা। যথারীতি সঙ্গে ছিল বজু। বজুকে ধরে নিয়ে যেতে কিছু লোক, রাজাকার (মতান্তরে মুক্তিযোদ্ধা) এসেছিল নদীর পারে। বাবা বজুকে ছাড়তে চায়নি। কারও কথাতেই নয়। এরপর গুলি চলে। বর্ষার রাতে বজু এবং আমার বাবা দুজনেই মরে যায়। লাশ পড়ে যায় আরিয়ল খাঁর ওই শাখানদীর জলে। সেই লাশ ভাসতে থাকে দিক-বিদিকহীন অন্ধকার আর প্লাবনে। এর মানে হল যখন আমি মা-কে প্রশ্ন করতাম, বাবা কই গেল ? কবে আইব মা ? তখন বাবার মৃতদেহ -- দীর্ঘদিন আগে ডিকমপোসড মৃতদেহ -- পঞ্চভূতে বিলীন হয়েছে। পৃথিবীতে খুব বেশি ছাপ রেখে যায়নি আমার হতাশ বাবা। কেউ কাঁদেনি তখন, অথবা হয়তো কান্নাও শুকিয়ে গিয়েছে ততদিনে। এক বোবা শূন্যতায় বাবার অনুপস্থিত শরীর এবং আত্মার স্বস্ত্যয়ন হয়েছিল খেলাৎবাবু লেনে। প্রশ্ন: মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে ঠিক কী ভেবেছিল বাবা ? কী দেখেছিল চরাচরহীন অন্ধকারে ? সবটাই কি অর্থহীন মনে হয়েছিল ? খুশি হয়েছিল কি এভাবে মৃত্যু নেমে আসায় এক দিগভ্রান্ত জীবনের মাঝখানে ? নাকি আর একবার প্রবল ভাবে বাঁচতে চেয়েছিল ? নতুন করে ? অভিনেতা ননীগোপাল চক্রবর্তীর মতো ? আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না বাবা ঠিক সেই বয়সে হয়তো গুলিবিদ্ধ হয়ে নদীতে পড়ে গিয়েছিল, এখন আমার যা বয়েস। কিছুতেই ভুলতে পারি না বাবা একবার বলেছিল, বাজাও নীল আকাশ। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার খুশিতে ঝকঝকে মুখের ওপর দিয়ে বেজে উঠেছিল বড়দির বিয়ের নহবতের সানাই। রাজজাক-সুচন্দা অভিনীত 'নীল আকাশের নীচে'-র টাইটেল সং-কে এক তুষারিত মুহূর্ত করে দিয়ে কোথায় চলে গিয়েছিল আমার বাবা। 'বাজাও নীল আকাশ'।

কোথায় যে বাবার জন্য একখোঁচা মনখারাপ রয়ে গিয়েছে আগে বুঝিনি। ন-বছর বয়সে যে পুরুষ দেওভোগ ছেড়ে চলে যায় এক বৃষ্টির রাতে, যাকে ভাল করে চেনাই হয়নি আমার, সে যে কীভাবে ফিরে আসছে আজকাল, কে জানে ? আমার এক খুব ভাল বন্ধু এই লেখা পড়ে প্রশ্ন করেছে, নাম অপরাহ্নরেখা কেন ? সত্যিই তো,

জীবনের অপরাহ্ন তো মধ্য চল্লিশ নয়। বরং এই সময়েই তো অনেকে তেড়েফুঁড়ে জেগে উঠতে চায়, আর একবার যৌবনযাত্রী হতে চায়। তাহলে ? আমার মনে হয় অন্তত আমার জীবনের এটাই অপরাহ্ন। খুব দীর্ঘ এক অপরাহ্ন যেন বরাদ্দ করা আছে আমার জন্য। সন্ধে আসতে হয়তো দেরি আছে এখনও। তবু এই অপরাহ্নে বাবার প্রতি আমার এই শেষ গার্ড অব অনার।

সেন্ট্রাল পার্কের ওই ছোট্ট ঘরে থেকেই আমার মধ্যে বোধহয় কোনও দায়িত্ববোধ জাগে। মনে হয়, এই তো ফিরে এসেছি আমার কলকাতায়। এবার পড়তে হবে। কাকুকে কথা দেওয়ার চাপ এই প্রথম বোধ করি। কিন্তু স্কুল যাওয়া ছিল খুব দীর্ঘ এক গল্প। সকালে ব্যাগ গুছিয়ে হেঁটে যাদবপুরে স্টেশনের পাশে ন-নম্বর বাস ডিপো। সেখান থেকে অফিসযাত্রীদের সঙ্গে লাইন দিয়ে আটটার বাসে শ্যামবাজার যাত্রা। পকেটে পয়সার কোনও প্রশ্নই নেই -- বাসের কুপন থাকত। ভিড়ের বাসে দু-জনের সিটের একেবারে প্রান্তে একাবেঁকা পৌনে তিনজন হয়ে যেতে কান্না পেত, কোমরে ব্যথা হত প্রচন্ড। দরদর করে ঘামতাম বেশিরভাগ দিন আর স্বপ্ন দেখতাম কবে আমি জানলার কোণার, এমনকি তার পাশের সিটটা পাব, যে সিটের সঙ্গে আড়াই প্যাঁচ খেলতে খেলতে আমাকে যেত হত অফিস-পাড়া পর্যন্ত। সেখানে বাস ফাঁকা হত। বাকিটা সময় কাটত কোমরের যন্ত্রণা সারাতে। তারপর স্কুল।

এটা তবু ঠিক ছিল। মুশকিল হল অন্য। কোনও দিন যদি মাঝপথে বাস খারাপ হত, ব্রেক ডাউন হত তার, যা কিনা প্রায়ই হত, তাহলে আমাকে মাঝপথে অপেক্ষা করতে হত পরের ন-নম্বর বা এল নাইনের জন্য যে বাসে ওই কুপন চলবে। সেসব দিনে ভীষণ কান্না পেত। অসহায়তা থেকে এক ধরনের বোবা কান্না আসে, সেরকম। সেন্ট্রাল এভিনিউতেই প্রায় হত কান্ডটা। ওখান থেকে বাড়ি যতটা দূর, প্রায় ততটাই দূর স্কুল। কামাই করলে হয়তো কাকু ভাববে আবার আমি পুরোনো জীবনে ফিরে গেছি। প্রদীপবাবু স্কুলে বেশ সম্মাননীয় শিক্ষক ছিলেন। অথচ ভাইপোটা -- এই চিন্তায় ছটফট করতাম রোদ্দুর, বৃষ্টি জলের লালবাজার বা সেন্ট্রাল এভিনিউ-তে দাঁড়িয়ে। দু-একবার প্রাইভেট বাসের কন্ডাক্টরকে দয়ালু মনে হলে অনুরোধ করেছি আমাকে বিনি পয়সায় যাওয়ার অনুমতি দিতে। কখনও কেউ নিয়ে গেছে, কখনও নেয়নি। একবার এক রোগা মতন কন্ডাক্টর ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, চল ফোট বানচোদ। একটা টানা রিকশার সঙ্গে ধাক্কা লাগতে গিয়ে লাগেনি রিকশাওয়ালার দক্ষতায়। সেই বৃদ্ধ বিহারী রিকশাওয়ালাও গাল দিয়েছিল। কেউ হেসেছিল আমায় দেখে। ওইদিন কাঁদতে কাঁদতে হেঁটেছিলাম অনেক দূর। এবার রীতিমতো ডুকরে ডুকরে। অসহায়তার সঙ্গে এবার মিশে গিয়েছিল ত্রাস। বহু দিন আর কোনও প্রাইভেট বাসের কাছে আমার অনুরোধ জানায়নি আমি। ভয়ে-মৃত্যু এবং অপমানের ভয়ে।

এখানে এসে হয়তো পাঠকের মনে হতে পারে আমি একটু আত্ম-অনুরাগে ভুগছি।

আহা রে আমাকে দ্যাখ-গোছের কোনও সেলফ-পিটি যেন কাজ করছে কোথাও। ঠিক বন্ধুরা, সম্ভব হলে আমি নিজের ছোটবেলাকার বদলে নেওয়ার চেষ্টা করতাম। সেন্ট্রাল এভিনিউতে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকা ওই কিশোরকে, ওই বয়েসি সব কিশোরকে, আমি শুভেচ্ছা জানাই। তারা যেন আর একটু ভাল থাকে। তাদের জন্য শোকপালন করছি এই পর্বে। তাদের মৃত বা দরিদ্র বাবাদের জন্যও।

পর্ব ১৯

তা বলে আনন্দ কি ছিল না মোটেই ? বরং উল্টো। এই প্রথম আমি এমন এক সঙ্গ পাই যা ঠিক আমার মনোমত। উত্তরের জীবনের বাইরেটা ছিল ভীষণ রগরগে, কর্কশ। তার সঙ্গে আমার বই পড়ার একটা জগৎ মিলত না। টেনিদার সাঙ্গোপাঙ্গোরা ছিল না ওখানে। ঘনাদা স্থানীয় একজন লোকও দেখিনি। নিশ্চয় এটাই পুরো উত্তর কলকাতা নয়। কিন্তু বখে যাওয়া শৈশব সুবিধের ছিল না। আমার বয়েসে পড়ার স্বাভাবিক বইয়ের প্রতিচ্ছবি ছিল না কোথাও। বরং ছিল তখন দুর্বোধ্য কিন্তু অসম্ভব রহস্যময় যৌন-উত্তেজনার বই পড়া। যার শীর্ষে পৌঁছে গেছিলাম কানপুর পর্বে। এই সব বাঙালি 'ঔপন্যাসিকের' নাম নিলে ঝুলে যেতে পারি, তাই শুধু বলছি, সিনেমার গল্প লেখক হিসেবে তিনি বেশ প্রসিদ্ধ ছিলেন -- একটা উপন্যাস একটা সিনেমা। অন্য ধরনের বইয়ের মধ্যে বড়দার উৎসাহে প্রথমে বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর' পড়ি, খাসা লাগে। কিন্তু নিষিদ্ধ আনন্দ পাই 'পাতাল থেকে আলাপ' পড়ে। তখনও প্রকৃত অর্থে যাকে 'পন্ডি' বলে তা পড়িনি। পরে পড়ে ভাল লাগেনি। হাসি পেত। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বর্তমানে নামকরা কবি, তার একটি ব্যক্তিগত লইব্রেরি ছিল। তার মেম্বার হই আমি। শিয়ালদার পন্ডি বাজারে তার সঙ্গে একবার গিয়ে দেখেছিলাম কী সমাদর তার ওই মহলে। যেন কোনও বড় পন্ডিত এসেছেন। আমার বরাবরই কৌতুহল ছিল বরং লেখকদের নিয়ে। কারা লেখে ওই সব বই, কী পরিস্থিতির মধ্যে লেখে -- এই সব নিয়ে। এই বিষয়ে এক মনোজ্ঞ গবেষণাধর্মী লেখার কথা ভেবেছিলাম অল্পস্থায়ী 'মেট্রোপলিটান' পত্রিকায়। ওই সান্ধ্য পত্রিকায় কিছু দিন আমি নাটকের রিভিউ লিখেছিলাম।

ভেবেছিলাম ওখানেই ছাপানো হবে লেখাটি। তথ্য-সংগ্রহে বিকেলের দিকে রক্সি সিনেমার আশপাশে ঘুরঘুর করতাম একটা পন্ডি-বইয়ের দোকানের সামনে। একদিন সেখানে দোকানের মালিক না, তার পাশের এক নিষ্ঠুর দেখতে মানুষ আমার কাছে এসে আমার ঘোরাঘুরির কারণ জিজ্ঞেস করলে আমি সত্যি কথা বলি এবং তাকে কিছু টাকা দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিই যদি সে আমাকে এরকম কোনও লেখকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। সে নিষ্ঠুর হাসি হাসে, ওছাড়া অন্য কোনও হাসি অবশ্য

তার পক্ষে হাসা সম্ভবও ছিল না। এছাড়া সে অত্যন্ত গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে আমাকে জানায়, 'ঔর কৈ সুন লেগা না, তো কাট দেগা'। এক অদৃশ্য কাঁচি দিয়ে সে এমন মোক্ষম এক কাটার ভঙ্গি করে যে আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। আমার দোষ নেই। তখন আমার বয়েস ২৬-২৭। আমি পরিকল্পনা ছেড়ে দিই। তবে এই বিষয়ে নিয়ে এক গল্প শুরু করেছিলাম যা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হই কারণ চূড়ান্ত প্রগতিশীল কাগজও ওই লেখা ছাপাতে সাহস পেত না। এসব অনেক পরের কথা। ১৯৭৭-৭৮-এ প্রত্যন্ত দক্ষিণের পাড়ায় আমার বন্ধুদের পাওয়ার কথা বলছিলাম।

ভদ্র, শিক্ষিত এই প্রধানত মধ্যবিত্ত পাড়ায় বাইরের একটা পালিশ ছিল, এক ধরনের সংস্কৃতিচর্চা ছিল অল্পবয়েসিদের মধ্যেও, যা উত্তর কলকাতার ওই বিশেষ অঞ্চলে দেখিনি। পুজোর পর দু-দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসব হত বড়-ছোট মিলিয়ে, বেশ ভাল লাগত নাটকে রোল ভুলে যাওয়া বেদনাবিধুর মুহূর্তগুলো। একটা লাইব্রেরি ছিল ছোটখাটো যেখানে নিয়মিত বই দেওয়া-নেওয়া হত। এটা হচ্ছে একটা দিক। অন্যটা গন্ডগোলের আর বড় মোহময়। সেটা হল চিরাচরিত বখে যাওয়ার দিক। সেটা এবার পরিণত চেহারা নিতে আরম্ভ করল। প্রথম বিয়ার খেলাম কয়েকজন বন্ধু মিলে যোধপুর পার্কে। দাঁত দিয়ে বোতল খুলল একজন আর তার প্রতি মুগ্ধতা মনে নিয়ে আমরা সবাই বিয়ার খেলাম একই বোতল থেকে -- চারজন। পরিমাণ এবং ফলাফল অনুমানযোগ্য। কাশির ওষুধে বোধহয় ওর চেয়ে বেশি অ্যালকোহল থাকে। তবুও আমরা ভুলভাল বকে ব্যাপারটাকে একটা বিশ্বাসযোগ্যতা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। পরে ওই বিয়ার খাওয়া নিয়ে মনে মনে হাসলেও একটা ব্যাপার লক্ষ করার মতো। মদের সঙ্গে যোগাযোগ সেই যে শুরু হল, তা থামেনি আজও। নেশা করা ব্যাপারটা দক্ষিণে অনেক বেশি চালু ছিল মনে হয়।

কোথায় ছিল পুব পাকিস্তান। মা যখন একা শুয়ে ভাবত কোনও কিছু শূন্য চোখে, তখন ওই দেশ ফিরে আসত। দুটোর মধ্যে কী যোগাযোগ ছিল কে জানে ? মাকে ওভাবে ভাবতে দেখে মনে পড়ে যেত পেয়ারাগাছের তলার রোদে একা থুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, পেছন থেকে মা ডাকছে, সেই গলা ছড়িয়ে পড়ছে উঠোনজুড়ে, পুকুরপাড়ে, আমলকি গাছ পেরিয়ে ছুটে যাচ্ছে সেই ধ্বনি। আমার ঘোর কাটছে না।

এরকম কোনও ঘটনা সত্যি ঘটেছিল কি না জানি না। ঘটতেই পারে কখনও। সব শিশুই বড় হয় মায়ের ওই সন্ধানী ডাক শুনে। কিন্তু আমার এক লহমায় দেখা পুব পাকিস্তানী স্বপ্নে ওই ছবিটা বিষন্নতার এক টুকরো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ঙ্কর এক অনিরাপত্তার মধ্যে বড় হতে হতে ওই সব মুহূর্ত কোনও এসকেপ রুটের মতো কাজ করত হয়তো। আদর পাওয়ার শখ মানুষের মরে গেলেও যায় না।

বাঙালপনার সব চিহ্ন মুছে গেলেও তাইলে কথাটা রয়ে গিয়েছিল শব্দভাণ্ডারে। অনেক

পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুরা পেছনে লাগায় এদেশি তাহলে তার জায়গা দখল করে।

ওপারের দুটি মাত্র মহকুমা শহর দেখেছিলাম গোটা শৈশবে -- গোপালগঞ্জ আর মাদারিপুর। গোপালগঞ্জে দু-দিন কাটিয়েছিলাম। নিশ্চয় খুব ছোট ছিলাম, নাহলে ট্রাই-সাইকেল চালানোর স্মৃতি থাকবে কেন মনে ? আর সেই হবু কুটুমবাড়িতে জলখাবার ছিল আশ্চর্য পাঁউরুটি, আমরা পাওয়া রুটি বলতাম। সকালে সেই রুটি সেঁকার গন্ধে জেগে ওঠার কথা মনে পড়ে। আনন্দের ঠিক পরিমাপ হয় কিনা জানি না। কিন্তু ওই সকালে জেগে ওঠার প্রত্যাশার আনন্দ আজ পর্যন্ত অন্য কিছুতে পাইনি। ইটের রাস্তা ছিল সামনে। সেই রাস্তা দিয়ে খট-খটে ট্রাইসাইকেল চালানোর মজা পেতে পেতে শিশু আমি বুঝতে পারিনি যে এ সমস্তই তৈরি করা কিছু দিনের ছবি, ভেতরে হাঁড়ির হাল। জামাইববু যে মূলত এক লক্কা পায়রা, হাতে কাজ-কাম নেই, চুলে টেরি কাটে অনেক সময় নিয়ে এবং মুখ্যত বাবার কেনা রিকশা ভাড়া দিয়ে তার ফূর্তির জীবন এসব বুঝি অনেক বড় হয়ে কলকাতায় এসে। শেষ বার বোধ হয় ভদ্রলোককে দেখি খেলাৎবাবু লেনে, ৭২-৭৩ সালে। দিদি, পুত্র-কন্যা নিয়ে ফিরে যায় স্বাধীন রাষ্ট্রে, ওখানেই বাস করতে থাকে। ছোড়দা আর জামাইবাবুর একটা ফটোর কথা মনে পড়ে ইদানীং। জামাইবাবু পপলিন জামা গায়ে যার ভেতর দিয়ে গোটা শরীর এবং তত দেখার মতো নয় এমন কিছুও দেখা যায়, পাশে একইরকম নায়কোচিত ভঙ্গিতে আমার কিশোর ছোড়দা। সেই ছবিটা কোথায় অবশ্য জানি না।

লঞ্চে যাতায়াত অবশ্য সবসময়ই একটা ঘোরের তৈরি করত মনে। নদী তেমন বড় ছিল না। কিন্তু আমি তো ছিলাম আরও ছোট, তাই বেশ ভাল লাগত ওপারে দৃশ্যমান অন্য গ্রাম দেখতে। দৃষ্টি খুব জড়িয়ে দেওয়ার উপায় ছিল না অনন্তে কারণ চারপাশে সামনে দূরে চেনা, সব গ্রামের নাম -- ডামইড্যা, কাশীপুর, ঝিকরকাঠি। সুদূর থেকেও তাদের জলরঙা শাড়ি এবং সবুজ পাড় আঁচল দেখা যেত যা বিশেষ সময় হয়তো অনন্তের আভাস পাওয়া যেত পারত। সেই বর্ষায় নদীতে লঞ্চ চলত কিনা মনে নেই, চলার কথা নয়। কিন্তু কল্পনায় বারবার সব অচেনা জায়গা আর নদীর নাম ভেসে উঠত -- ঢাকা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, মেঘনা, রূপসা, তিতাস। পদ্মার নাম কেন জানি না টানত না মনকে। নদীটা দেখার অবশ্য ব্যাপক ইচ্ছে ছিল।

এ পাড়ায় এসে এক বন্ধুকে পেলাম যে ঠিক আমারই মতো পালিয়ে এসেছিল ওপার থেকে। ঠিক আমার বয়েসি রুপন এসেছিল চট্টগ্রাম থেকে। অর্থৎ প্রায় একই সময়ে আমরা দুই ভিন্ন দিক দিয়ে ইন্ডিয়ায় ঢুকি। পাকিস্তানি সিনেমার গান গাইতাম আমরা একসঙ্গে, বন্ধুরা পুলকিত হত, মানে মজা পেত। গান বলতে সেই বিখ্যাত 'নীল আকাশের নীচে আমি', 'যারে যাবি যদি যা' বা 'রিকশাওয়ালা বলে কারে তুমি আজ ঘৃণা করো ?' এই সব গান গেয়ে বোধহয় আমরা বন্ধুদের থেকে একটু আলাদা হতে

চাইতাম, কারণ পাশাপাশি আমরা অমিতাভ বচ্চনের যুগেও বড় হচ্ছি। ডন-এর গান গাইছি আমরা, কিন্তু ওরা গাইতে পারছে না ভিন দেশের গান। এই পদ্ধতি অবশ্য কাজ দিত না। ওরা পাত্তাই দিত না আমাদের পুবপারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে।

মুশকিল হল এই যে আমি বাঙাল অঞ্চলে ঢুকলাম দরকচা মারা ঘটি মন নিয়ে। এখানে সেই সময় এবং এখনও প্রতাপে বেঁচে আছে পুব বাংলার ভাষা এবং আচার-বিচারের ধারা। আমার ঘটি বন্ধুরাও দক্ষতার সঙ্গে যে ভাষা বলতে পারত, সে ভাষা আমিই ভুলে গেলাম কৃষ্ণনগরের চাপে। কেতাবি ভাষা শিখে 'পরদেশ, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি' জাতীয় ডায়ালগেও ধিকৃত করেছি নিজেকে। তবে এটা বুঝে আত্মপ্রসাদ পেতাম যে কেতাবি বাংলা আমি আয়ত্ত করেছি চমৎকার। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব আমার সঙ্গী, ততদিনে কবিতা লেখাও শুরু হয়ে গিয়েছে। গভীর ঘোরে লেখা কিশোরী মেয়েদের নিয়ে সব জবরদস্ত প্রেমের কবিতা। আশপাশেই বসবাস করত তারা, কোনও রকমের কবিতার সঙ্গে একটুও যোগাযোগ না রেখে। অথবা লিখতাম এখান-ওখান থেকে টোকা প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা। পরে বুঝতে পেরেছি ওর মধ্যে প্রতিভার ছিটেফোঁটা চিহ্ন ছিল না।

এ পাড়ায় আসার কিছুদিন পরই একটা খুব দু:খের ঘটনা ঘটে। আমি খুব রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে ভালবাসতাম। তখন রেকর্ডের যুগ। এল-পি, ই-পি জাতীয় রেকর্ড, তার ওপরে গায়ক-গায়িকার ছবি -- সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। বড়দার কেনা গীতবিতান বাড়িতে ছিল একটা। সেটা প্রায় মুখস্ত করে ছেড়েছিলাম। এখনও রবীন্দ্রনাথের গানে কেউ ভুল শব্দ ব্যবহার করলে রাগ হয়। এসব ঠিক ছিল, কিন্তু গান শোনার উপায় ছিল সীমিত। রেডিও বা এর-ওর বাড়ি গিয়ে গান শোনা। মার-আমার গরিব সংসারে গান শোনার যন্ত্র ছিল না আর কোনও। এই সময়েই মাসিমার সঙ্গে আলাপ হয়।

মাসিমা এবং মেসোমশায়ের মধ্যে খুব খারাপ সম্পর্ক ছিল। মেসোমশাই একই বাড়িতে আলাদা থাকতেন এবং নিজে রান্না করে খেতেন। ওদের এক ছেলে ছিল। বছর পাঁচেকের বড় আমার থেকে। তার নাম, ধরা যাক, বুদ্ধদেব। বুদ্ধদা খুব হুল্লোড়ে ছেলে ছিল বলে ওকে ভাল লাগত। তখনও বুঝিনি যে ওই হৈ-চৈ ছিল একটা মুখোশ। বাবা-মার টকে যাওয়া বাড়িতে থাকতে থাকতে বুদ্ধদা মুখোশ পরায় রপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ওর এক দিদি ছিল, যে কিনা শুনেছিলাম এককালীন বাঘা সুন্দরী, তখন বড় চাকুরে স্বামীর সঙ্গে কলকাতার বাইরে কোথাও থাকে।

মাসিমা যে কী করে জানতে পেরেছিলেন আমার গান ভাল লাগার কথা, আমি জানি না। মনে নেই। কিন্তু আমি যাতায়াত শুরু করেছিলাম মাসিমার কাছে, ছুটির দুপুরবেলায়। মাসিমা খুব ভালবাসতেন আমায়। মৃদুভাষী মানুষ ছিলেন। একটা

অদ্ভুত মন ছিল তাঁর। কী দেব এর নাম ? শিল্পীমন ? খুব সেনসিটিভ ছিলেন উনি। আর আশ্চর্য সংগ্রহ ছিল রবীন্দ্রনাথের গানের। ওখানেই প্রথম দেখি এক পুরোনো ই-পি। একপিঠে কণিকা ('দেলো সখি দে') অন্যদিকে চিন্ময়ের ('তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা') তরুণতর বয়েসের ছবি-সহ। আমার ভগবান তখন দেবব্রত বিশ্বাস। তাঁর গানে ভর্তি মাসিমার ঘর। আমি পাগলের মতো গান গিলতাম, গলা মেলাতাম, মাসিমা গাইতেন। আমরা এক অদ্ভুত সময় কাটাতাম ওই দুপুরবেলা। কোনও কোনও দুপুরে হয়তো আমি মাসিমার কাছে গেছি আর বুদ্ধদা আড্ডা মারতে বেরোচ্ছে, আমাকে দেখলেই গলা তুলে মাকে ডেকে বলত, 'মা, তোমার চামচাটা এসেছে।'

আমরা সবাই যে কী এক ভয়ঙ্কর ট্রাজেডির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম বুঝিনি তখনও। একদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে দেখি গোটা পাড়ার লোক যেন রাস্তায় নেমে পড়েছে। একটা থমথমে ভাব। কোলাহল নেই। অতগুলো লোক কিন্তু কেউ কোনও কথা বলছে না শব্দ করে। শুধু এখানে ওখানে ফিসফিস। অশুভ ফিসফিসে স্বর মোড়ে মোড়ে। আমাদের দলটাও ছিল। এগিয়ে গেলাম। জানা গেল, বুদ্ধদার মৃতদেহের জন্য অপেক্ষা করছে সবাই। প্রায় সেই সময়েই মাসিমা উন্মাদের মতো বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে। চিৎকার করছিলেন উনি, এমন আর্তনাদ জীবনে আমি কমই শুনেছি। একটু পরে রাস্তায় বসে পড়লেন। কেউ তুলতে পারল না তাঁকে। আমি গেলাম। উনি চিনতেই পারলেন না। এতক্ষণ পরে হয়তো খবরটা ভাঙা হয়েছিল মাসিমার কাছে। কোনও লাভ হয়নি।

নৈহাটি না কোথায় যাচ্ছিল বুদ্ধদা, কলেজের কোনও ওয়ার্কশপে। বার বার ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে অর্ধেক শরীর বের করে দিচ্ছিল বাইরে। কেউ বারণ করলেও শুনছিল না। এরকমই একটা সময় লাইনের ধারের থাম্বায় মাথা লেগে যায় ওর। মুহূর্তে মস্তিষ্কে রক্তপাত। মৃত্যু। অনেকে বলেছিল ইচ্ছেমৃত্যু। বন্ধুদের নাকি ও মাঝে মাঝেই বলত বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না ওর।

এরপর মাসিমা কোথাও চলে যায় অর্ধোন্মাদ হয়ে। বোধহয় মেয়ের কাছে। মেসোমশায়কে কিছুদিন দেখতাম বিকেলের বারান্দায় বসে রাস্তায় অথবা দূরে কোথাও তাকিয়ে থাকতে। তারপর আর দেখিনি। জানতাম না কী পড়ে আছে সেই দুপুরের ঘরটায়। সেই ই-পি, এল-পি রেকর্ডগুলো। সেই জীবন আচ্ছন্ন করে রাখা দেবব্রত বিশ্বাস।

এখন ওই বাড়িতে অন্য কারা যেন থাকে।

পর্ব ২০

টেন-এ পড়ার সময় আমি দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে যাই। কারও কাছে জেনেছিলাম উনি ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের পাশে একটা দোকানের গায়ের গলিতে থাকেন। দোকানটার নম 'লেডিজ ওন'। ততদিনে আমার ওঁর সম্বন্ধে যা যা লেখা পাওয়া যায়, পড়া হয়ে গিয়েছে। 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত'ও পড়ে ফেলেছি। আমার মুগ্ধতা ছিল অপরিসীম, সেটা অবশ্য আজও আছে, তবে পরিসীম। ধড় ধড় বুক নিয়ে আমি দেবব্রত বিশ্বাসের সামান্য আস্তানায় পৌঁছে যাই। খুব ছোট্ট একটা ঘর। তার সামনের দিকে, সম্ভাব্য অতিথির মুখোমুখি একটা টেবিল, তার ওপর হারমোনিয়াম। কিন্তু সেখানে তখন অজস্র ইনল্যান্ড লেটার আর খাম রাখা। পাশে পানের বাটা আর কলম। আমি পরিচয় দিতে গিয়ে তুতলে যাচ্ছিলাম, কিন্তু উনি শুধু আমায় বসতে বললেন। আমি একটা টুলে বসলাম। দেবব্রত বিশ্বাস চিঠি লিখতে লিখতে বললেন, 'চা খাইবেন ?' আমি ভদ্রতা করে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, উনি বললেন, 'আমি অ্যামনিই অ্যাখন খাইতাম'। তাঁর ডাকে একজন রোগা মতন লোক এসে কথা শুনে চলে গেল। আমি মৃদু গলায় বললাম, 'আমাকে আপনি বলে ডাকবেন না।' উনি বললেন, 'আমি সকলেরই আপনে বইলা ডাকি, চাই যে তারাও আমারে আপনে কউক।'

চা এল। উনি চিঠি লিখে চললেন। অনেকক্ষণ পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি অনেক চিঠি লেখেন ?' উনি লিখতে লিখতেই উত্তর দিলেন, 'হ। দ্যাশে-বিদেশে লিখতে হয়। হাঁফানির ওষুধ লাগে তো। এখানে পাওয়া যায় না।' আবার নৈশব্দ। চিঠি লেখা। কত কথা জানার ছিল। সব ভুলে গেছি। এত সব গানের মধ্যে শুধু একটাই গান মাথায় ঘুরছে, তাও রবীন্দ্রনাথের নয়, নজরুলের, 'বনকুন্তল এলায়ে'। সেই গানে আচ্ছন্নতা কাটাতে কাটাতে বললাম, 'আপনার কার গান শুনতে ভাল লাগে - মানে রবীন্দ্রসঙ্গীত ?' উনি নির্দ্বিধায় উত্তর দিলেন, 'হেমন্তের। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের।' লিখে চললেন। আমি প্রশ্ন খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ উনি একেবারেই বিরক্ত হচ্ছেন না। কিন্তু আমার ওপর চাপ তৈরি করছে কথোপকথন না হওয়া এই মুহূর্তগুলো। একসময় শেষ বিকেলে আমি উঠে পড়লাম। উনিও একটা পান বানিয়ে মুখে পরলেন। আবাহন নেই, বিসর্জন নেই। কিছু দিন পরে আর একবার গিয়েছিলাম। একই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেবারও। একইভাবে বেরিয়ে এসেছিলাম। মানুষটাকে দেখে যে বিরাট পুলকিত হয়েছিলাম, এমন নয়, কিন্তু ফেরার সময় পুরো রাস্তা জুড়ে কানে বাজত 'উদাসিনি বেশ বিদেশিনী কে সে'। কিছুটা পয়সা বাঁচানোর জন্য আবার কিছুটা গান শোনার জন্যও হাঁটতে হাঁটতে ফিরেছিলাম দুদিনই।

হাঁটা কোনও বড় ব্যাপারই ছিল না তখন। বহু বার লাইটহাউস বা গ্লোব থেকে সিনেমা দেখে নিজাম-এ বিফ রোল খেয়ে দু-তিনজন বন্ধু হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরেছি।

অনেক সময় লাগত, কিন্তু ভালোও লাগত নিশ্চয়। ওরকম অনেক ছেলেই ছিল তখন। আমার বন্ধু রানা, যে কিনা বড়লোকের ছেলে, চট করে ৩৫ টাকা বইপ্রতি টিনটিন কিনে ফেলতে পারে তিনটে, একসঙ্গে, সে-ও হাঁটত। ব্লেজিং ম্যাগনাম, এন্টার দ্য ড্র্যাগন বা জেমস বন্ডের সিনেমা দেখে, সেই নিয়ে গল্প করতে করতে, শন কনোরি আর রজার মুরকে নিয়ে দুনিয়া কাঁপিয়ে বাড়ি ফিরত কিশোরেরা। ১৯৭৮-৭৯ সালে, কলকাতা তখনও ছিল কলকাতাতেই। বাংলা ছবিও তখন দেখা হত/যেত। মানে যাকে কমার্শিয়াল ছবি বলা যায়, সেই ধরনের ছবিও দেখত শহুরে মানুষেরা বিভিন্ন হল-এ গিয়ে। আমাদের মতো কিশোরেরাও দেখত। ছোটবেলায় পুব পাকিস্তানে দেখা পাঁচখানা ছবি -- সন্তান, আঁকাবাঁকা, ডাকবাবু, প্রতিকার, তানসেন -- তখনও মনে পড়ত। তিরিশ পেরোনোর পরও কোথাও একটা কৌতুহল ছিল সে-সব ছবির অভিনেতাদের নিয়ে। কেবল চ্যানেলে ঠিক ওই সিনেমাগুলো না হলেও, ওই সব নায়ক ইত্যাদিদের পরে দেখে বড় ব্যথা পেয়েছি। মনে হয়েছে, না দেখলেই হত। নস্টালজিয়াকে পুষতে হয়। বাস্তবের সঙ্গে মেলাতে গেলে অনেকগুলো বাড়তি বিষয় হারিয়ে গিয়ে বাস্তবের দুর্বলতাই বার বার চোখে পড়ে। প্রায় প্রত্যেক নায়কই যে কেন পরচুলা পরতেন, আমি বলতে পারব না। ওটা কি অভিনয়ের একটা স্বাভাবিক অংশ ছিল ? মানে পরচুলাও কি ছিল সাধারণ মেক-আপ-এর অঙ্গ ? এ বিষয়ে কেউ তথ্য দিলে বাধিত হব।

১৯৭৮-এ একটা বান ডাকে, যাতে ভেঙে পড়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন বটগাছ। সেদিন আমি আশিসদা নামের এক প্রতিবেশীর সঙ্গে কী একটা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম ধর্মতলায়। কলকাতা যখন বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে, তখন আমরা সিনেমা হল-এ মুগ্ধ চোখে দেখছি হলিউডের ম্যাজিক। সিনেমা ভাঙার পর এক আশ্চর্য দৃশ্য -- এক অন্য কলকাতা। গা শিরশিরে বৃষ্টি চলছে তো চলছে। কলকাতা ভাসমান। নৌকোর মতো চলে যাচ্ছে গাড়ি-বাস। তার গতি দেখলে ভেতরে ঠাসা মানুষদের জন্য করুণা হয়। ভেতরের মানুষেরা জানত যে কোনও মুহূর্তে থেমে যেতে পারে যান। ব্রেক ডাউন হওয়াটা, আগেই বলেছি, রোজকার ঘটনা ছিল। বাইরের রড ধরে হাঁচোরপাচোর ঝুলতে ঝুলতে ভিজতে ভিজতে হাঁচতে হাঁচতে ভেতরে বসে থাকা ভ্যাপসা যাত্রীদের রক্ত জল করা চাহনি দিতে দিতে কোনওভাবে চলে যাচ্ছিল নোয়ার নাওয়ের যাত্রীরা। আশিসদা আর আমি হাঁটাই স্থির করলাম।

কী ভয়ঙ্কর সেই হাঁটা। হাঁটু অব্দি জল, আমার ধরা যাক তখন পাঁচ ফুট আট/নয় ইঞ্চি, আশিসদা কমপক্ষে তিন ইঞ্চি ছোট তখনকার আমির চেয়ে। পাশাপাশি হাঁটতে গিয়ে তার ওপর একটা মানসিক চাপ ছিল নিশ্চয়। আমার হাঁটু তো ওর কোমর। শেষে কালীঘাট পেরিয়ে সাদার্ন এভিনিউ ধরতে গিয়েই আমরা ভুল করলাম। তখন আমার কোমর তো আশিসদার বুক। সিনেমা দেখিয়েছিল আশিসদা, খাইয়েছিল কিছু। তার দুরবস্থায় আমার করুণা হচ্ছিল। বিশেষত ভয় করছিল যখন ছোট-খাটো গর্তে

পড়ছিল পা। আশিসদাকে অতল জলের আহ্বান থেকে বাঁচানোর জন্য আমি উদ্যোগ নিতে গিয়ে দেখছিলাম, আশিসদা বিরক্ত হচ্ছে। আমি বয়েসে কুড়ি বছরের ছোট হয়ে উচ্চতায় বড় হওয়ার দীনতায় ভুগছিলাম। আমার পেট্রনের ওই আকুলি-বিকুলি বড় বেদনার মতো বাজছিল প্রাণে।

অবিশ্বাস্য দেখাচ্ছিল সাদার্ন এভিনিউ। মনে পড়ে যাচ্ছিল বর্ষার রাতে দূর থেকে দেখা গ্রামের নদীর কথা। ঝোড়ো হাওয়া আর টানা বৃষ্টি। তখন বর্ষণ নয়। কিন্তু রাহুল দ্রাবিড়ের সেরা টেস্ট ইনিংস-এর মতো এক মাপে হয়ে চলা বারিপাত, মাঝেমধ্যে ছবির মতো কাভার ড্রাইভ, মানে বাজ-বিদ্যুৎ, এই করে স্কোর বাড়ছিল। লেক কালী বাড়ির কাছে আসার আগেই আমরা বুঝতে পারি এ রাস্তা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে গেছে, সেখানে বেঁটে-লম্বায় তফাত শুধু তিন মিনিটের। আমরা পেছন ফিরে গড়িয়াহাট দিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ শুরু করি। অবশেষে প্রায় মধ্যরাতে বাড়ি পৌঁছুই ম্যাটিনি শো-এ সিনেমা দেখে। ফেরার সময় দেখি ভাঙা গাছটা যাদবপুরের। তখনও ইনিংস চলছে। একইভাবে। সেবার ভেসেছিল পুবপাড়ের দেশগুলো। আমার জন্মের দেশও ভাঙছিল নিশ্চয়। যা কিনা তখন আর দেশ নয়, না ভিতরে না বাহিরে।

একটা সমস্যা চলছে লিখতে গিয়ে। আমি বুঝতে পারছি। সব সত্যি লিখতে পারছি না। সত্যি বলার বা লেখার মধ্যে একটা সাইকোঅ্যানালিটিক আনন্দ আছে। ভেবেছিলাম এভাবে চালানো যাবে। কিন্তু খুব কষ্ট হয় খণ্ডিত সত্যি লিখতে। অথচ সব সত্যিই খণ্ডিত এ-রকম একটা সময়ে আমরা বড় থেকে বুড়ো হচ্ছি। প্রথম যৌবনেই বুঝতে পেরেছিলাম যুধিষ্ঠির কিছু ভুল বলেননি। রাজনৈতিক দিক থেকে ভুল নয়। বরং বাংলায় ব্যবহৃত সব চেয়ে সার্থক তৎসম শব্দবন্ধ বোধহয় 'ইতি গজ' -- আজ তক।

এদিকে পুরো মিথ্যে লেখাও সম্ভব নয়। এ জাতীয় লেখায় খুব শক্ত পুরো মিথ্যে বলা। লেখার পরে নিজেকে মার্চের এই অসময় বৃষ্টিতে ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে পাপোষের মতো মনে হয়। তাই উত্তর কলকাতার সেই মাঝবয়েসী ভদ্রলোকের নাম বাদ দিতে বাধ্য হচ্ছি যার মেয়ে আমারই বয়েসি ছিল তখন, অথচ উনি আমাকে ওই দশ-এগারো বছর বয়েসেই বাছা বাছা কুৎসিত গালাগাল শেখান। সেকেলে অর্থে সুদর্শন অর্থাৎ ফর্সা লম্বা নোয়াপাতি ভুঁড়িওয়ালা ওই ভদ্রলোকের খুব কুদর্শনা এক চাকুরে স্ত্রী ছিলেন আর ঠিক মায়ের মতোই দেখতে একটি মেয়ে। ভদ্রমহিলা সারা সপ্তাহ পরিশ্রম করেও রোববার সমস্ত কাজ করতেন বাড়ির। তখনকার মহিলাদের, বিশেষত ও-সব অঞ্চলে, বাইরের রাঁধুনি দিয়ে কাজ করানো স্বপ্নের মতো অসম্ভব ছিল। আর স্ত্রীর উপার্জনে খেতে অভ্যস্ত লোকটি বাড়ির কোনও কাজ না করে সারাদিন আমার সমবয়েসি বা বড় ছেলেদের এক নোংরা যৌনতায় দীক্ষা দিত। ওর শেখানোর ধরনে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল

এই যে উনি খুব গুছিয়ে প্রায় বৈজ্ঞানিকের মতো শিক্ষা দিতেন। একেবারেই ভুল কিছু তথ্য দিতেন এমন ভঙ্গিতে যেন অ্যানাটমির ক্লাস নিচ্ছে।

ওই সব বৈজ্ঞানিক দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে আমি দক্ষিণে এসেছিলাম। প্রথমে বন্ধুরা তা বোঝেনি। আমার চেহারায় একটা গবাকান্ত ভাব আছে বলেই বোধহয় কানপুরে সমকামীদের আমাকে এত ভাল লেগেছিল। একই কারণে আমার এ অঞ্চলের বন্ধুরা আমাকে ভুল বুঝছিল। একা ছাদে ঘুরতে ঘুরতে কবিতা পড়তাম বলে তারা আমাকে আগেই লক্ষ করেছিল। ভবিষ্যতে আলাপ হলে যে ভাল মুরগি জুটতে চলছে তা ভেবে তারা পুলকিত ছিল। সেই স্বপ্ন ব্যর্থ হয়েছিল। আমি না ছিলাম গবা, না ছিল আমার টাকা। রেফিউজি ছাপটা তখন এসে আটকে গিয়েছিল দারিদ্রের গহ্বরে। ভাল মুরগি হওয়ার কোনও যোগ্যতাই ছিল না আমার।

মনে আছে বন্ধুরা, আমার লেখার নাম অপরাহ্নরেখা। কিন্তু এ-লেখা শেষ হবে আমার প্রথম কৈশোরে। আমার হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় পাশ করার পর পরই। মোদ্দা কথায়, অর্ধেকটা থাকবে আমার গ্রামজীবন আর বাকি অর্ধেক এপারের জীবন। নয় আর নয় আঠের বছর। এরপরের গল্প, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত, রেফিউজি সমস্যা মুক্ত নয়। কারণ তার পরেও অনেক দিন লড়তে হয়েছিল, অনেক উদ্বাস্তুর মতো আমাকেও, পড়াশুনো করে ক্রমাগত নড়বড়ে অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। এখন বার বার মনে হয় একটা বাড়তি রোখ ছিল যেন কোথাও। বাড়ি-ঘর ছিল না বলেই বোধহয়। কারণ আমি অনেক বন্ধুকেই ওই বাড়ি-ঘর-দোরের নিরাপত্তাটুকুর জন্য বসে যেতে দেখেছি।

এই লড়াইয়ের সব চেয়ে প্রশস্ত রাস্তা ছিল টিউশন দেওয়া। ক্লাস টেন-এ পড়ার সময় একটি সিক্স-এর ছেলেকে পড়ানো দিয়ে এই জীবনের শুরু। টিউশন না থাকার বিভীষিকা নিশ্চয় অনেকেরই মনে আছে। সিগারেটের দোকানে ধার, গরিব দোকানদারকে ধারে সিগারেট খেয়ে টাকা ফেরত দিতে না পারার অপরাধ। একদিন ভাগ্যদোষে তার মুখোমুখি হলে ছেলেটির অপ্রত্যাশিত মিষ্টি হাসি, আর গলা নামিয়ে বলা, 'মৃণালদা, কিছু দিতে পারবেন ? বড় টানাটানি ...'। ওই অদ্ভুত হাসি, আমার সম্মান রাখার চেষ্টা, ধরে বাঁচার দীনতাবোধ, ভূতের মতো তাড়া করবে সারা জীবন। সেবার আমার ধার শীর্ষে পৌঁছেছিল -- একশো কুড়ি টাকা। সাল ১৯৮২, আমি সেকেন্ড ইয়ার-এর ছাত্র। ভদ্রলোকের ছেলে আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি আমার চেয়েও রোগা, অপুষ্টিতে রোগা, দিন রাত খেটে চলা, দু-তিন বছরের ছোট একটা ছেলের কাছ থেকে। শেষমেশ তার ওই লাজুক হাসি, ম্লান ওই কথাগুলো -- রেফিউজি

ছিলাম বলেই তো বড় লেগেছিল। রূপক-ও তো রেফিউজি, এক বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে ওর লড়াই আমার চেয়ে কত কত বড়। অথচ ওই হাসি ...।

রূপক নামটা লিখেই ফেললাম। ও এখনও আছে এ অঞ্চলে। একই সাইজের দোকান নিয়ে। একই রাস্তার ধারে। ওটা অন্য একটা রেফিউজি লাইন -- হারিয়ে যাওয়া উদ্বাস্তু-বার্তা।

পর্ব ২১

আজ যখন এই মধ্য মার্চে বৃষ্টি নামে তখন মনে পড়ে যাদবপুরে এম এ পড়ার (না-পড়াও বলা যায়) এক সন্ধেবেলা তখনকার অবারিত লবিতে বসে জয়দেবের একটা টাটকা কবিতা শোনার কথা -- 'মার্চ সন্ধ্যার বৃষ্টিতে আজ মিষ্টি হল না ইষ্টকুটুম।' রেফিউজি লাইন থেকে মধ্য মার্চের বৃষ্টিমেদুর যাদবপুরে পৌঁছনোর গল্প অবশ্য নয় এটা। এ গল্প থেমে যাবে ১৯৮১ সালে। তখনও দক্ষিণ কলকাতায় একটা চাপা আক্রোশ ছিল ভদ্রলোক রেফিউজিদের নিয়ে। অনেকের ধারণা ছিল তাদের ব্যক্তিগত অনেক অসফলতার জন্য উদ্বাস্তুরা দায়ী। ঠারে-ঠোরে বলেও দিত সে-কথা। কিন্তু কেউ কেউ ছিল যারা ছিন্নমূলদের লড়াই-এর, ক্রমাগত মূলস্রোতে ঢুকে পড়ার তাগিদের তারিফ করত। তাদের জন্যই বিনামূল্যে পড়ার বই জুটে যেত, জুটে যেত দু-একটা টিউশন। না হলে আমাদের মতো অনেককেই বোধহয় মাঝপথে থেমে পড়তে হত।

দু-বছরের মাধ্যমিক পর্ব শেষ হয় ১৯৭৯ সালে। পরীক্ষার সিট পড়েছিল পূর্ণশ্রী সিনেমার পাশে একটা স্কুলে। বেশ জামাই আদর পেয়েছিলাম প্রথম কদিন। কাকুরা এসে টাকা দিয়ে যেত বা মিষ্টি আর ডাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত স্কুলের গেটে। প্রথম হাফ শেষ হলেই জিভ লকলকে রোমাঞ্চ নিয়ে দুরদার নামত ছাত্ররা। আমার তাড়া ছিল আরও বেশি। এরকম তোয়াজ পাওয়া প্রথম বার।

মাঝারি গোছের সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করলাম। মাঝখানে আরও বদ কাজ শিখে ফেলেছিলাম। তখনও পাড়ায় পাড়ায় কাশ্মীরি শালওয়ালারা চলে আসত শীতের অনেক আগে। আমাদের পাড়ায় যেহেতু ছেলেমেয়েদের মেলামেশায় তেমন কোনও বাধা ছিল না, তাই ওই শালওয়ালারা আমাদের একটু-আধটু তোয়াজ করত ওই বান্ধবীদের সঙ্গে আলাপ করে নেওয়ার বাহানায়। তাদের লোভ দেখাতাম আমরা দু-একজন। তাদের পয়সাতেই জীবনে সত্যিকারের মহৎ মদ -- রাম এবং আনুষঙ্গিক চাট খাই। খেয়ে লদলদে অবস্থা হয় এবং গন্ধ তাড়ানোর হাঁসফাঁস চেষ্টায় বাড়ি

ফেরার সময় ওয়ে ওয়ে ডাস্টি ডেথ দীর্ঘতর মনে হতে থাকে। এরকম দু-একটা চেষ্টার পর শাল বিক্রেতা মহলে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলাম আমরা। পাড়ায় এক কোণায় একটা ঘরে ভিড় করে থাকত এরা। পরের দিকে আমাদের দেখলেই উল্টো পথে হাঁটতে শুরু করত। ততদিনে ওরা বুঝে ফেলেছিল যে আমরা বিনিময়ে কিছুই দেব না, শুধু ওদের টাকায় মদ-মাংস খাব। আমার এই মিশনের সর্বক্ষণের সঙ্গী যে বন্ধু সে এখন প্রতিবেশী। এখনও সেসব গল্প করি আমরা এবং হেসে গড়িয়ে পড়ি আতঙ্কিত কাশ্মীরি শালওয়ালাদের কথা ভেবে।

কাশ্মীরি আতঙ্কবাদের শুরু সম্ভবত সেই সময় থেকেই। শুরু করেছিলাম আমরা দুই কিশোর। পরে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করায় এত সংখ্যক ছেলেরা এগিয়ে আসে বিভিন্ন মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে, যে শালওয়ালারা পাট গোটায়।

এর মধ্যেই কবে যেন আমি নিজেই পুব বাংলার মানুষদের বাঙাল বলতে আরম্ভ করি ব্যঙ্গার্থে। ব্যাপারটা অনেকটাই ঊনিশ শতকের সদ্য ইংরেজি শেখা 'বাবু'দের স্বজনকে নেটিভ বলে গাল দেওয়ার মতো। এই ঘৃণ্য অভ্যেস ছাড়িয়ে উঠতে সময় লাগে অনেক।

এগারো-বারো ক্লাসের হায়ার সেকেন্ডারি শিক্ষাক্রমে ভর্তি হওয়ার সময় কোনও দ্বিধা ছিল না মনে। কাছাকাছি এক কলেজে ভর্তি হই। আর্টস নিয়ে। ভুলে যাবেন না বন্ধুরা, ওই সময় ছেলেরা আর্টস পড়লে তাদের অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের সঙ্গে লড়তে হত। লেডিজ বলে ক্ষ্যাপাত বন্ধুরা। তার মধ্যে আমি আবার ছিলাম চূড়ান্ত লেডিজ, কেন না আমার বিষয় ছিল পলিটিক্যাল সায়েন্স, হিস্টরি, ফিলসফি এবং সংস্কৃত। ফটাফট মুখ চলত বলে মুরগি করতে পারেনি বন্ধুরা কিন্তু একটু গ্লানিবোধ রয়ে গিয়েছিল আমার নিজের মধ্যেই। কীভাবে যে এসব ভুলভাল পৌরুষ সম্বন্ধে ধারণা জন্মায় মনে, কে জানে ? বিজ্ঞান বা কমার্স না পড়লে 'ছেলে' হওয়া যায় না, ইঞ্জিনিয়াররা পৃথিবীর পক্ষে আদর্শমূলক জীব এসব। পাশাপাশি এই সেক্সিস্ট ধারণাও বাড়তে থাকে যে মেয়েরা শুধু আর্টসই পড়বে, সেজেগুজে তক্কে তক্কে থাকবে পুরুষশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ারের জন্য, তারপর বিয়ে-মা-আন্টির প্যাকেজ ট্যুর।

এসব বরাবরই গোলমেলে লাগত, কিন্তু মেনে নিতে হত বন্ধুদের আগ্রাসী চিৎকারে। যাদবপুরে পড়তে এসে তুখোড় সব মেয়েদের দেখে বুঝতে পারি আমিই ঠিক ছিলাম, আর ওরা ভুল। আমার ওই পুরুষতান্ত্রিক গাড্ডায় ঢুকে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা ছিল। খুব লড়াই করতে হয়েছে না-ঢোকার জন্য।

এরকম একটা সময়েই লেননকে খুন করা হয়। সেদিন আমার এগার ক্লাসের এক বন্ধু, জয়ন্ত শোকাহত। চাপা জিনস পরা বিষন্ন জয়ন্তকে মনে পড়ে। খায়নি কিছু।

আত্মহত্যা করার কথা ভেবেছিল। কদিন আগে স্কুটার দুর্ঘটনায় মারা গেল জয়ন্ত। ওর বাবা ওই কলেজেই আমাদের বাংলার শিক্ষক ছিলেন। পরে যখন আমি ওখানেই পড়াতে ফিরে আসি, তখন স্যরের মুখে জয়ন্তের খবর পেতাম শুধু। এরপর উনি রিটায়ার করলেন, আর বছর কয়েক আগে চলে গেল জয়ন্ত।

এক সহপাঠীকে মনে আছে, অজয় নাম। কলেজের পাশেই বাজারে ওদের কাপড়ের ব্যবসা ছিল, পড়াশুনো করত না। হায়ার সেকেন্ডারির ইংরেজি পরীক্ষার দিন পেছন থেকে হুশ হাশ করে জিজ্ঞেস করেছিল, 'লাকি-টা কী রে ?' পরে বুঝেছিলাম ও লুসির কথা বলছে, ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসি।

এক সহপাঠিনীর প্রেমে পড়ে যাই বেহেড। ওর দিকেও সব সিগনাল ছিল মৃদু-যেমন হয়। ওদের খোলামেলা বাড়িতে যেতে পারতাম যখন তখন। অনেক দিন হেঁটে ফিরেছি একসঙ্গে। কিছুতেই কথাটা বলতে পারিনি। গলা-টলা শুকিয়ে পাটকল। বন্ধুরা সাহস জুগিয়েছিল। আমিই ভিতুর মতো, মানে কিছুই বলে উঠতে পারিনি। ওকে অন্য কোনও ছেলের সঙ্গে রাস্তায় দু-কদম হাঁটতে দেখলেও একটা ঝিংকিটে রাগে মাথা ভার হয়ে থাকত। কথাই বলতাম না ওর সঙ্গে। ও বুঝতে পারত না কী সমস্যা। আমি তথৈবচ। কিন্তু কথাটা বলা হয়ে উঠল না। কোনও একসময় আমার ব্যাপারে পুরোপুরি হতাশ মেয়েটি এক সিনিয়র ছেলের প্রেমে পড়ে যায়। তখন আমার রাগও হত না তেমন, ততদিনে পাড়ার একটি নতুন, এবার একতরফা -- আমার দিক থেকে -- মেয়ের প্রেমে আমি হাবুডুবু। তবে গল্পটা ঠিক এরকম নয়।

এর অনেক বছর পর ওই কলেজেই একটা ক্লাস নিতে নিতে বিকেলের জানলার পাশে একটা বেঞ্চে চোখ পড়ে আমার। মরা রোদ এসে পড়েছিল ওই ফাঁকা বেঞ্চে। ওখানেই বসত মেয়েটা। নির্জন ওই বেঞ্চের দিকে তাকিয়ে হু হু করে কান্না পেল আমার। কোনও কারণে ফাঁকা পড়ে থাকা ওই বেঞ্চ মনে করিয়ে দিল যে সোমা বেঁচে নেই। কোনও কালে মরে গেছে মেয়েটা দুরারোগ্য কিডনির অসুখে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ই জানতে পেরেছিলাম। আমার পঁচিশ বছরের বন্ধু এবং সহপাঠী ইন্দ্রাশিস বলেছিল কোন ১৯৮২ সালে। ওর কোনও রকমের বোন ছিল সোমা। তারও দশ বছর পর সেই বিকেল, লালচে রোদ, ওই নির্জন বেঞ্চ পাগল করে দিল আমায়। সোমাকে একবার বাঁচিয়ে তুলতে ইচ্ছে করল। একবার ওকে বলতে ইচ্ছে করল, 'আমি তোকে ভালবাসি'। ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। কীভাবে ক্লাস সামলেছিলাম আজ মনে নেই।

সব ভাল মনে পড়ে না। কবে যেন সোমা, আমি আর কয়েকজন বন্ধু মিলে শ্বাশ্বতীর বাড়িতে গেলাম, কোথায় যেন ছিল বাড়িটা। একটা গ্রাম-গ্রাম জায়গায় ? সেখানে আমার অনুরোধেই শ্বাশ্বতী গেয়েছিল, 'মেঘ ছায়ে সজল বায়ে'। ওই গানের মধ্যেই

একবার আশ্চর্য দৃষ্টি-বিনিময় হয়েছিল আমাদের, সোমার-আমার। শুধু চোখাচোখি। সেদিনও ফেরার পথে আমরা এক সঙ্গে হেঁটেছিলাম গড়িয়া থেকে বাড়ি। তেমন কোনও কথা না বলে। ওই চোখ চাওয়া-চাওয়ির রেশ, ওই এক মুহূর্ত, ওই 'ইন্সট্যান্ট মেড ইটারনিটি'র ধরা পড়ে যাওয়া স্খলিত সময়, আমাদের নীরব রেখেছিল।

সেই ঘরটায় এখন আর কোনও ক্লাস হয় না। সোমার কোনও স্মৃতি কলেজে পড়ে নেই। অনেক বদলেছে কলেজ। আকারে বেড়েছে অনেক। পনেরো বছর বয়েস বেড়েছে আমার সেই প্রবল বিকেলের পর থেকে। রিজেন্ট এস্টেটের গলি দিয়ে শর্টকাট করতে গিয়ে আচমকা ওদের কোয়ার্টার্স-এর দিকে কত বছর হয়ে গেল আর চোখ যায় না। কিন্তু এই মাঝে-মধ্যে পুরোনো বন্ধুদের কথা মনে পড়ে। বেদনাময় সব কিছু। যা একসময় আনন্দের ছিল, সেসবও কেমন একটা মেঘলা রঙের টুপি পরে সবার মুখ লুকিয়ে গুটি গুটি হেঁটে যাচ্ছে অলি-গলি ধরে। ডাকলেও ফিরে তাকাবে না।

এই দু-বছরে মধ্যে, অর্থাৎ আমার হায়ার সেকেন্ডারির ৭৯-৮১ বিস্তৃত সময়ে, কোনও একদিন উত্তমকুমার মারা যান। আমরা কলেজ থেকে অনেকে মিলে তাঁর মরদেহ দেখতে যাই নবীনা সিনেমার সামনে। একটা ট্র্যাকে শোয়ানো পুব দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেতা। খুব বেশি বয়স হয়নি তাঁর। ওই বয়েসে অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছিলেন তিনি। আমার দ্বিতীয় কোনও বাঙালি অভিনেতার নাম পড়ে না যাঁর ছবি গ্রাম এবং শহরের কিশোর-যুবকেরা দেখত বা দেখে। বয়স্কদের কথা বাদই দিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের মৃতদেহ সংরক্ষণ করার যে বিচিত্র উন্মাদনা তাঁর গুণগ্রাহীদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল, যেভাবে তাঁরা মৃত মানুষটির চুল-দাড়ি ছিঁড়ে রেখেছিলেন বলে শুনেছি, সেরকম ভাগ্য উত্তমকুমারের হয়েছিল কিনা জানি না। অত অল্প সময়ে এক ঝলক দেখে সব বোঝা যায়নি। লরিতে মৃতদেহের পাশে বসে ছিলেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এটুকু মনে আছে।

এরই মধ্যে আমার বড় ভাইয়ের ইচ্ছায় আমার পৈতে নিতে হয়। সে এক বিশ্রী অভিজ্ঞতা। মনে মনে তখনই আমি মঙ্গলময় ঈশ্বরকে সন্দেহ করতে শুরু করেছি। নিজের টাকা না থাকলে বা উপার্জনশীল বাবা-মা না থাকলে অনেক প্রতিবাদের ভাষাই লুকিয়ে রাখতে হয়। আমার বিশ্বাস বাবা বেঁচে থাকলে আমার সমস্যাটা বুঝত। অনেক সংস্কারমুক্ত ছিল বাবা। আজ হাসি পায় ভাবলে, যে গায়ত্রী মন্ত্র নাকি মেয়েদের এবং অবামুনদের বলা নিষেধ, তা লতা মঙ্গেশকরের গলায় সুপারহিট গান হয়ে বামুন-অবামুন নির্বিশেষে সবাইকে পুলকিত বা বিরক্ত করে চলেছে। বারো ক্লাস থেকেই লুকিয়ে-চুরিয়ে পৈতে ছাড়ি, ইউনিভার্সিটিতে ঢুকে সরাসরি বিসর্জন। তখন আমি এতদিন যাঁদের ওপর আর্থিক দিক থেকে নির্ভরশীল তাঁরা কলকাতায় ছিলেন

না। যে তখন আমার অন্ন-বস্ত্রের জোগানদার, সেই ছোড়দার নিজেরই পৈতে হয়নি। এক অর্থে সে বিশ্বাসী মানুষ হলেও ছোট ভাইয়ের পৈতে না পরার ব্যাপারে অহেতুক সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েনি। আমার ওপর জোর খাটাতে চায়নি কখনও। ছোড়দা-বৌদির কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

টাকাপয়সার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল তখনও। কিন্তু ওই নিয়ে ভাবিনি, স্বাধীনতা সবচেয়ে জরুরি। এই প্রথম স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। জামা-কাপড় পুজোয় একবার। আর উল্টোদিকের বাড়ির এক বাবলিদি ভাইফোঁটা দিত বলে তখন আর একটা জামা পাওয়া যেত। সেই জামা শুঁকেই কেটে যেত দু-একদিন। কোথাও কোনও আক্ষেপ ছিল না। বরং খুশি হওয়ার খবর ছিল অনেক। এই সময় ছোড়দার মেয়ে জন্মায়। ১৯৮১-র সরস্বতী পুজোর দিন। সেই গেঁড়ে বাচ্চা আমায় আনন্দে ভরিয়ে রেখেছিল বেশ কয়েক বছর। যতদিন ও বাড়িতে ছিলাম ততদিন। এরপরে যখন পাড়ায় আবার ফিরে আসি, তখন সে বেশ লায়েক হয়ে গিয়েছে। ছোট মেয়েটাকে আমি বরাবর মিস করে যাব।

মাঝে-মধ্যেই দুদ্দাড় করে টিউশন পেয়ে যেতাম। এই নিয়ে নানান মজার ঘটনাও ঘটত। সহৃদয় মানুষ প্রচুর ছিলেন। তেমনই আবার ছিল টিট্টিরে শয়তান গোছের মামা বা কাকা। তাদের বাড়িতে থেকে ছেলে-মেয়েগুলো পড়ত আর তারা এই ফাঁকে আমাদের মাইনে-টাইনে থেকে টাকা ঝেড়ে বিড়ি খেত। একবার একটা পুরো আকাট টাইপের ক্লাস এইটের ছেলেকে পড়াতে গিয়ে আমি যখন ক্লান্ত, তখন সে হঠাৎ বাবার কাছে ফিরে যায়। দেড়শো টাকা ছিল মাসমাইনে। আমি তার কাকার কাছে যাই বাঘাযতীনে। লোকটা অন্ধকার সেই ঘরে, যেখানে কিছুদিন আগেই আমি পড়াতাম, খাটের ওপর বসে বিড়ি খাচ্ছিল। আমাকে দেখে থতমত খেয়ে উঠে বসে। বলে, ছেলে তো নাই। আমি একজন স্বস্থ্যবান বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে গেছিলাম আমার দাবি জোরদার করার জন্য। সে সাজানো গম্ভীর গলায় বলে, আপনে আছেন, দ্যান। লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আলমারি খুলল। স্টিলের আলমারি চাড় মেরে খোলার সেই অপূর্ব শব্দ মন মোহিত করল আমার। লোকটা টাকা বের করে এক হাত পেছনে রেখে অন্য হাতে একশো টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দিল। সেটা ছোঁ করে নিয়ে বললাম, আর বাকি পঞ্চাশ ? প্রায় কান্না সামলিয়ে লোকটা বলল, আর তো টাকা নাই। ওতো পুরো মাস পড়েও নাই। আমি বললাম, আপনার লুকনো হাতে নিশ্চয় টাকা আছে। আমার বন্ধু পেছনে চলে গিয়ে বলল, সব দশ টাকার নোট রে। লোকটা ফঁস করে শ্বাস ফেলে বলল, যদি একটু কনসিডার করেন।

একশো তিরিশ টাকায় রফা হল। বাইরে বেরিয়ে স্বাস্থ্যবান বন্ধু একাই দশ টাকার খাবার খেয়ে নিল।

পর্ব ২২

টিউশন দেওয়ার সঙ্গে জড়িয়ে থাকত অবিচ্ছেদ্য জলখাবারের মোহ। চোঁ চোঁ করে খিদে পেত তখন। বেশিরভাগ বাড়িতেই এত ভালবাসা পেয়েছি যে বলার নয়। বৌদি-কাকিমা স্থানীয় মহিলারা বোধহয় ভাবতেন বেচারা ছেলেটা খেতে পায় না, তাই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমাকেও দুর্দান্ত সব জলখাবার দিতেন। লুচি-তরকারি-কচুরি এসব। প্রচুর পরিমাণে। ওঁরা জানতেনও না যে বাড়ি থেকে হয়তো সেদিন ছ-টা রুটি খেয়ে বেরিয়েছি। তবে একটা কথা ঠিক, ওই দু-বছরে একদিনও রুটি বা ভাত ছাড়া অন্য কিছু বাড়িতে খাওয়ার কথা মনে পড়ে না। তাই অন্যরকম খাবার পেলেই গোগ্রাসে গিলে নেওয়ার তাগিদ হত। প্রথম টুইশন দিই ক্লাস টেন-এ। একটা সিক্স-এর ছেলেকে পড়াতাম। মাইনে ছিল তিরিশ টাকা মনে হয়। সপ্তাহে দু-দিন পড়াতে হত। ওটা তিন দিন হলেও আমার আপত্তি ছিল না জলখাবারের কথা ভেবে। মাসের প্রথম হলে তো কথাই নেই। ভরপেট জলখাবার চা খেয়ে বাইরে এসে একটু লুকিয়ে সিগারেট ধরানোর স্মৃতি, বিশেষত মাইনে পেয়ে, ভোলা যায় না। হ্যাঁ, সিগারেট খেতে হত লুকিয়ে। বড়রা দেখলে অপমানিত বোধ করতেন, দাদা গোছের ছেলেরা অহেতুক খ্যাঁকখ্যাঁক করত।

ইলেভেনে ভর্তি হয়ে বই কেনাটা সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। ইতিহাস আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বই এক বছরের বড় এক বন্ধুর কাছে হাফ দামে কিনলাম। দর্শনের বই নিয়ে সমস্যায় পড়লাম। ফার্স্ট পেপার-এর বইটা নতুন কিনতে এক মাসের টিউশন ফিস শেষ। কিন্তু সেকেন্ড পেপার কী হবে ? রেফিউজিদের যদি বিশেষ কোনও ভগবান থাকেন, তাহলে নিজেও তিনি নিশ্চয় রেফিউজি। তিনি সমবেদনাশীল এবং অনেক তৎপর। কারণ এই সময়েই একটি মেয়ে এল পাড়ায় হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিয়ে আত্মীয়ের বাড়িতে ছুটি কাটাতে। আমার বন্ধুর তুতো-দিদি। তাকে দেখতে তত ভাল ছিল না যতটা সে অন্য অর্থে আকর্ষণীয়া ছিল। এই ব্যাপারটা সব ছেলেই অল্প বয়েসে বুঝে যায়। অনেক সময়, হায়, ভুলও বোঝে।

ছাদে পয়চারি করত সে বিকেলবেলায়। স্বভাবতই আমার বন্ধুর বাড়ির আশপাশে আমাদের বৈকালিক ভ্রমণ বেড়ে গিয়েচিল। এমন কি অনেক অনেক উত্তেজনাকর আলোচনা -- ক্রিকেট এবং ফুটবল নিয়ে -- ওইখানে দাঁড়িয়ে করাটা নিয়মের মধ্যেই পড়ত। তখনও সোমার সঙ্গে তেমন বন্ধুত্ব হয়নি আমার। হলে ওই মোহজালে জড়াতাম না। সারা জীবন বিস্তর প্রেম করেছি, কিন্তু একসঙ্গে দুটো কখনও না। আমার মতো গন্ডার-সদৃশ একনিষ্ঠ প্রেমিক আমি আজও দুটো দেখিনি।

যাই হোক, জানা গেল সে মেয়েটিও আর্টস নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছে। তার কম্বিনেশনে

ফিলসফি আছে জেনে আমি ব্যাপক লাফ মেরেছিলাম। মেয়েটি আমার বন্ধুর মাধ্যমে আমাকে সেকেন্ড পেপারের বইটা দেয়। বুক হিম হয়ে আসে যখন দেখি বইটা ইংরেজিতে। আমি বাংলা মিডিয়ামে পড়তাম। পড়ানোও হত বাংলায়। কিন্তু উপায় নেই। এক মেঘলা বিকেলে ছাদে ঘুরে বেড়ানো মেয়েটিকে আমি 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলি। সে উত্তরে অদ্ভুত এক হাসি হাসে যা আমাকে বেশ কিছুদিন ফ্যান্টাসিতে আচ্ছন্ন করে রাখে।

পড়াশোনা এত ভাল হতে থাকে যে আমি নিজেই থতমত খেয়ে যাই। ফিলসফি পড়াতেন যে ম্যাডাম (পরে আমি তাঁর সহকর্মী হই) তিনি খুব ভাল পড়াতেন এবং নিয়মিত টেস্ট নিতেন। কুড়ি নম্বরের পরীক্ষায় কোনও দিন সতেরোর কম পাইনি। বুঝতে পারি যে সিলেবাস থেকে অঙ্ক এবং বিজ্ঞান চলে গিয়ে আমি অনেক ভাল আছি। আত্মবিশ্বাস বাড়তে থাকে। পরে বহুবার ভেবেছি যে অবহেলিত ছোটবেলার অনেক সুবিধে আছে। আমাকে যদি জোর করে অন্য কিছু পড়ানো হত আমার ইচ্ছেয় কান না দিয়ে, তাহলে নিশ্চয় আজ বসে যেতাম। এগারো থেকে বারোয় ওঠার পরীক্ষায় ইংরেজিতে একশোয় আশি পেয়ে সব সেকশনে প্রথম হয়ে আবার থতমত। তবে ভালোও লাগছিল খুব যখন এক মাস্টারমশাই, সদ্যপ্রয়াত দেবেশ চক্রবর্তী, আমাকে টিচার্স রুমে নিয়ে যান সবাইকে চিনিয়ে দিতে। একই সঙ্গে মরমে মরে যাওয়া আর আনন্দেও, জীবনে প্রথম চিহ্নিত হওয়ার আনন্দে থরথর পা কাঁপতে থাকা সেই কিশোরকে আমার ভাল করে মনেই নেই আজ। শুধু সেই মুহূর্তের অনুভূতি মনে আছে।

আর মনে আছে সোমার মুখে হঠাৎ জেগে ওঠা একটা হাসি। কথা নয়, অভিনন্দন নয়, শুধু ঝকঝকে একটা হাসি। ওই হাসি যে পুরুষ জীবনে তার প্রিয় নারীর মুখে একবারও দেখেনি, তার জীবন বৃথা। পড়াশুনোর ব্যাপারে আমি একবার, শুধু একবারই দেখেছি ওই হাসি। ওর পর মনে হয়নি জীবনে কোনও অভাব-অভিযোগ থাকতে পারে।

ক্লাসে খুব অসুবিধা হত। বাংলায় ক্লাস চলছে আর ইংরেজি বইয়ে আমার চোখ। মাঝেমধ্যে ইংরেজিতে স্যর টার্মগুলো লিখে দিতেন বলে কোনওরকমে পড়া এগোত। এই বিচিত্র পদ্ধতিতে পড়া চালানোর ফলে আমাকে দুটো পেপার দুই ভাষায় দিতে হয়েছিল।

আবার বলছি বন্ধুরা, এই সব লেখার পেছনে কোনও আত্মকরুণা নেই। আমি পড়াশুনোর এই দুই বছর খুব সুখেই ছিলাম। ভাল রেজাল্ট করলেই কোনও গর্ব হওয়া তো দূরে থাক, আমার বরং মনে হত একটু বাড়তিই পেয়ে গেলাম। এক ধরনের হীনমন্যতা বোধ তৈরি হয়েছিল যা এখনও রয়ে গিয়েছে। এর অঙ্গে রেফিউজি

জীবনের কোনও যোগাযোগ ছিল নাকি এটা মনে নিয়েই জন্মেছিলাম, তা জানি না। এর মধ্যেই সোমার সঙ্গে ওই যোগাযোগ যার মধ্যে ভালবাসার সব মশলা থাকলেও প্রকাশ্য কমিটমেন্টের জায়গা ছিল না। প্রতি দিন বাড়ি ফিরে নিজেকে মনে মনে থাপ্পড় মেরেছি সোমাকে কথাটা না বলার জন্য। ভেবেছি পরের দিনই বলে ফেলব। রাতে বলে ফেলেওছি এবং বীরের মতো ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রেমের গান নিয়ে সোমার সঙ্গে যা যা ভাবার ভেবেছি। পরের দিন কখনও আসেনি।

হঠাৎ সোমা বেড়াতে চলে গেল কোনও এক ছুটিতে। এলাহাবাদ না লখনউ কোথায় যেন। আমি ভূতগ্রস্তের মতো ঘুরে বেড়াতাম ওদের বাড়ির আশপাশে শেষ বিকেলে। সব দরজা জানলা বন্ধ বাড়িটার। মনে হত, অনেক দিন যেন পার হয়ে গিয়েছে। ও আজই চলে আসবে, আর যদি আসে, মাইরি, আজই বলে দেব কথাটা -- বলবই বলব।

সোমা এল কলেজ খোলার পর। তাও প্রথম দিন নয়। প্রথম দিন আমি মনে তীব্র ইচ্ছে এবং বাইরে কিছুই এসে যায় না ভঙ্গি নিয়ে সারাদিন একলা লড়ে গেলাম। অনেকক্ষণ পরে, যখন এমনকি আশার খড়কুটো আঁকড়েও বিশ্বাস রাখা যাচ্ছে না ওর আসার, তখন ভীষণ ক্লান্ত শরীরে, এক পেট খিদে নিয়ে বিকেলবেলা আবার ওদের বাড়ির দিকে গেলাম। অন্ধকার, জানলা বন্ধ বাড়ি। আমার রাস্তায় বসে পড়তে ইচ্ছে করছিল। আমি গোটা ঘটনায় এক তীব্র বিশ্বাসঘাতকতার ইঙ্গিত পেলাম। গলার কাছে গোল্লা পাকানো যন্ত্রণা নিয়ে ফিরে এলাম বাড়িতে।

পরের দিন কী হল তার পুরো বিবরণ দিতে ইচ্ছে করছে না। ওদের ট্রেন লেট করেছিল, বহু রাতে বাড়ি পৌঁছেছে, কী কী ঝামেলায় পড়েছিল রাস্তায়, এসব আমি মুখে মৃদু হাসি নিয়ে প্রাচীন প্রফেটদের মতো শুনে যাচ্ছিলাম। বাকি বন্ধুরা নানা কথা বললেও আমি কিছুই বলিনি। ফেরার পথে সোমা জিজ্ঞেস করেছিল, তোর কী হয়েছে ? এমন কেন করছিস ? আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, কী রকম করছি ? আমার ভেতরটা ভেঙে পড়তে চাইছিল সব কিছু বলার জন্য। সম্ভব হলে ওকে দু-চার ঘা লাগিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু আমি রেফিউজির ছেলে। ওসব কেতাবি ব্যাপার আমার শোভা পায় না। হীনমন্যতাকে নিরাসক্তি দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করে গেলাম। আর ভেতরে সব জ্বলে গেল আমার।

এই সময় আর একটা জিনিস বাড়তে থাকে। ইংরেজি বই পড়ার ঝোঁক। আমার বন্ধুরা টকাটক পড়ে ফেলছে অ্যালিস্টার ম্যাকলিনস, জেমস হ্যাডলি চেজ। সেই নিয়ে ইংরেজি মিডিয়ামে পড়া বান্ধবেরা আমাদের সামনে রোঁয়া ফোলাচ্ছে। একে ভেতরে একটা সমস্যা হত। কিন্তু টানা ইংরেজি বই পড়ে যেতে কষ্ট হত, সময় লাগত অনেক। গোঁয়ার্তুমির মাধ্যমে অনেক কিছু করা যায়। ওদেরই কাছ থেকে বই নিয়ে পড়তে

শুরু করি। কয়েক মাসের মধ্যে অনেক বই পড়ে ফেলি। ম্যাকলিনসের 'ফিয়ার ইজ দ্য কি' দারুণ লেগেছিল। ওতে জ্যারনসকি বলে একটা দুর্দান্ত চরিত্র ছিল। এই সব বই পড়তে পড়তে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। এটা হয়তো রেফিউজি লাইনের অবদান। ক্রমাগত আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর চেষ্টা করা। এর ফলে কদিন বাদে আমার ভাল স্কুলে পড়া বন্ধুদের পাশে হাঁটতে অসুবিধা হত না আর। তবে সব বাংলা মাধ্যমে পড়া ছেলেমেয়েদের মতোই ইংরেজি বলতে খুব অসুবিধে হত। অনেক কষ্ট গিয়েছে এই অসুখ তাড়াতে। এবং সেখানেও আবার লড়াই।

আমার মনে হয় সব লড়াইয়ের মধ্যেই একটা বেদনা জন্ম নেয়। সেই বেদনার বোধ পরবর্তী জীবনে ছাপ ফেলে কোথাও না কোথাও। এক ধরনের বিষন্নতা কাজ করে সব কিছুতেই। বাইরে থেকে হয়তো বোঝা যায় কি যায় না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে চলতে থাকে এক প্রবহমান বিকেলবেলা। মনে করুন যেন নদীর ধার, সূর্য এই ডুবব ডুবব করছে। এপার বাংলার ভাগিরথীর জলে ফেড ইন করছে এক গেঁয়ো নদী। সন্ধে হওয়ার আগেই জঙ্গল ঝুপঝাপ অন্ধকার করে দিচ্ছে নিজেকে। চারদিকে খুব ফূর্তির শব্দ। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে এই সব কান্ড দেখে। কিন্তু এই সব কিছুর মধ্যে আমি কোথাও নেই। আর কারা কারা যেন নেই। কিছু কিছু শব্দ যেন বদলে যাওয়া বাংলাদেশের বুকে মোচড় দিয়ে একটা ৪৫ বছরের লোকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে বেদনার ছোট ছোট পুলটিশ। হাসি-ঠাট্টা-হুল্লোড়ের মধ্যে ঠিক ফিরে আসে রাতের আরিয়ল খাঁ। ওইখানে সব হিসেব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। সেই হিসেবের জের আজও চলছে।

আমি জানতাম না কত সালে জন্মেছিলাম। তখন সাল-তারিখের হিসেব রাখত না কেউ। মা শুধু জানত ২৩শে চৈত্র আর শুক্রবার। তিনটে বছর ছিল সম্ভাব্য -- ১৯৬১, ৬২, ৬৩। '৭৪-এর এক সকালে কুট্টিদাদুর ঘরে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা নিয়ে বসেছিলাম। কুট্টিদাদু তখন বেঁচে নেই। উল্টো দিকের খাটে শুয়ে থাকত। সেদিকে চোখ যাচ্ছিল বারবার। ২৩শে চৈত্র আর শুক্রবারের পথ ধরে পৌঁছলাম ১৯৬২-তে। গা শিরশির করে উঠল যখন দেখলাম কুট্টিদাদুর সুন্দর গোটা গোটা হাতের লেখায় -- 'গোপালের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান কুট্টির জন্ম, আনুমানিক সকাল সাত ঘটিকায়।'

গা ছমছমে এক অবস্থায় আমার পুনর্জন্ম হল। ১৯৬২ সাল, ৬ এপ্রিল। দান্দার চিঠিতে নিশ্চয় কুট্টিদাদু ঘটনাটা জানতে পেরে পঞ্জিকাতে লিখে রেখেছিল। তাই হয়তো রেওয়াজ ছিল। সেই যে নিজের জন্মসূত্র খুঁজে পেলাম, আবিষ্কার করলাম নিজে নিজেই, তখনও জানতাম না আর কী কী রাখা আছে জীবনের ভাঁড়ারে। এখনও জানি না। আরিয়ল খাঁর সেই শাখানদীটি কেমন আছে, আজ খুব জানতে ইচ্ছে করে।

পর্ব ২৩

১৯৯৮ সালে, যখন এ-পাড়ায় আমি ফিরে আসি, তখন এক বিকেলে আমার সমবয়সি একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়। সে তখন তার বাচ্চার শরীর খারাপ বলে ডাক্তার খুঁজছে। আমি একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। যেতে যেতে কথা হয় দু-একটা। হঠাৎ আমি বলে ফেলি, 'তোমাদের সাদা রঙের অ্যাম্বাসাডর ছিল না একটা ? ডব্লিউবিজি ১৪৫৫ ?' ও হাঁ হয়ে যায়। 'তোমার মনে থাকল কী করে ?' আমি কিছু না ভেবেই বলে ফেললাম, 'একটা সময়ে আমি তোমার প্রেমে পড়েছিলাম, তাই।' মেয়েটি হেসে উঠল। ওই হাসি একমাত্র মেয়েরাই হাসতে পারে। দুটো অর্থ ওই হাসির। এক, প্রেম কথাটাকে প্রায় সতের বছর দেখাদেখি না হওয়া সত্ত্বেও, আমি সহজে বলে ফেললাম। আর প্রেম তো একটা ছিলই আমার দিক থেকে। সেটাও নিশ্চয়ই খুব মজার একটা অনুভূতি, ছেলেমানুষী, বলে মনে হল ওর। আমিও হাসলাম। ডাক্তারের বাড়ি দেখিয়ে চলে এলাম ওকে।

আমার এগার ক্লাসের শেষাশেষি ওরা পাড়ায় আসে। আমার এক বন্ধুর দুই তুতো-বোন। একই ক্লাসে পড়তাম আমরা, অবশ্য বিভিন্ন কলেজে। শ্রেণী ফারাক বেশি ছিল ওদের সঙ্গে। কিন্তু সেটা জাহির করার মতো বোকা ওরা ছিল না। এক বোনের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব ছিল। অন্য জন ছিল মনের মধ্যে চলতে থাকা টাইম-বম্ব। তীব্র এক ক্লাইম্যাক্স-সন্ধানী প্রেম। ওরা দুজনে স্কার্ট-ব্লাউজ পরে সকাল আটটার মিনিবাস ধরতে যেত। আমি যেতাম পাজামা পার্টি পেছন পেছন। এই ধরনের প্রেম এত বিরল এখন।

প্রেমে পড়ার কারণ, আমাকে দেখেই দুদ্দাড় পালিয়ে যেত ও। ওই পালানোর মধ্যে এক প্ররোচনামূলক কিনকিনে ডাক পেতাম আমি। তাছাড়া আমার হৃদয় বৈষ্ণবী প্রেম বিলাতেই এসেছিল পৃথিবীকে। পরে উপলব্ধি হয়েছিল যে ওরা আমাদের মতো রাস্তায় আড্ডা মারা ছেলে খুব বেশি দেখেনি আগে। তারপর আমার লম্ফঝম্ফ একটু বেশিই ছিল। ওরা বিকেলের দিকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিখরচায় এক বাঁদর-নাচ দেখত। একবার ভলিবল খেলায় জিতে আমি খুব জোর লাফ দিয়েছিলাম। দৃশ্য দেখে ওপরের বারান্দা থেকে ক্লাস ইলেভেনের জুলিয়েট আমাকে বড় করে ভেঙাল। এর পরেও যদি প্রেমে না পড়ে একটা সতের বছরের ছেলে, আমার মতো কমিটেড প্রেমিক, তাহলে বেঁচে থাকার মানে কী ?

একেবারেই অঘটনাবহুল এই প্রেম। শুধু একটা ব্যাপার মনে আছে। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরনোর পর আমার বন্ধুর মাধ্যমে ও জানিয়েছিল আমায় খাওয়াতে হবে। আমার হাতে একটা টাকা নেই তখন। তার ওপর ওরা কী পছন্দ করে আমি

জানি না। আমি যে জীবনে অভ্যস্ত তাতে মিষ্টি খাওয়া মানে খাওয়াই। আমি কারও কাছ থেকে দশ টাকা ধার করে মিষ্টির বাক্স নিয়ে চলে গিয়েছিলাম সন্ধেবেলা ওদের বাড়ি। পিসি-পিসে, মানে ওদের মা-বাবা, সেদিন থাকবেন না জানতাম। গলা শুকিয়ে কাঠ আমার। তার ওপর ওদের দুটো স্পিৎস কুকুর ছিল। কুকুর দেখলেই আমার ভয়ে দমবন্ধ হয়ে আসে। একমাত্র প্রেমের জন্যই আমি প্রাণ হাতে করে ও বাড়িতে ঢুকলাম।

ঘরে অল্প আলো জ্বলছিল। একটি মেয়ে ছিল। আমি যাকে চাই সে নয়। পাশের ঘর অন্ধকার। সেখান থেকে কিশোরের গলায় ভেসে আসছিল 'হাম ঔর তুম থে সাথি'। খুব সুন্দর বাতাস বইছিল সেদিন। পাশের ঘরের পর্দা উড়ছিল সিনেমার দৃশ্যের মতো। খালি ও আসছিল না। অন্য জন অস্বস্তি বোধ করছিল এতে। ওর খারাপ লাগছিল। বার বার উঠে কিছু বলতে যাচ্ছিল পাশের ঘরকে। পাশের ঘর প্রত্যাখ্যান করছিল। আমি সব বুঝতে পারছিলাম। গোটা রেফিউজি গরিব জীবন আমার বন্ধুর মতো চোখ মেরে কাঁধে হাত রেখে বলল, 'চ পাগলা, বাইরে চ।'

আমি বন্ধুকে বললাম, 'চলি রে, টাটা'। সে শুকনো মুখে হাসল। মিষ্টির বাক্সটা ঢুকেই রেখে দিয়েছিলাম ডাইনিং টেবিলের ওপরে। ফিরতে গিয়ে দেখলাম ওটাকে। কেউ খাবে না। পাশের ঘরে অন্য গান চলছিল, মনে নেই কোনও গান। কিন্তু আগের গানটা জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। এখনও অচ্ছেদ্য জড়িয়ে আছে ওই দৃশ্যগুলোর, ওই বাতাসের আর ওই অনন্ত অন্ধকার ঘরে কিশোরের গলা, আমার রেফিউজি কৈশোর।

এর কদিন আগেই হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট বেরিয়েছিল। ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছিলাম। আমার পক্ষে সেটা খুবই ভাল। আশপাশের অনেকে তোল্লা দিচ্ছিল। অনেকে আবার ভাবছিলেন একটা দুর্ঘটনা হয়েছে। আমি আগেই ঠিক করেছিলাম যাদবপুরে ইংরেজি নিয়ে পড়ব। শুনেছিলাম সেটা শক্ত কাজ। এ নিয়ে খোঁজখবর করছিলাম। পাশের বাড়ির এক ভদ্রলোকের শালা ইংরেজি নিয়ে পড়ত। তার কাছে মার্কশিট দেখাতে সে বলল, 'এতে হবে না'। আমি দমে গেলাম।

ঘটনাচক্রে ওতেই হল। পরে আমাদের অনেক বার দেখা হয়েছে। এক বছরের সিনিয়র ছিল ভাস্কর। আমি প্রায় প্রত্যেকবার যে কোনও কথাবার্তার শুরু-অন্ত-শেষে একবার বলে দিতাম, 'ওতেই হয়েছে ভাস্কর।'

তবে এসবও কিছু পরের কথা। আমার মোনোলগ শেষ হবে প্রাক যাদবপুর পর্বে। হায়ার সেকেন্ডারি শেষ হওয়ার পর প্রায় তিন মাস যখন বসেছিলাম, সেই সময়ই শেষ। একবার টাকা না থাকার সমস্যা এতটা ঝামেলায় ফেলেছিল যে কোনও একটা ঝাপসা চাকরির খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলাম সেন্ট্রাল এভিনিউর সেই চেনা,

ভয়ঙ্করভাবে চেনা, পথে। একটা ঘুপচিগোছের অফিস, অন্ধকার ঘর, একজন জীবনে সর্বতোভাবে হেরে যাওয়া মানুষ, বছর ৫০ বয়স হবে, কোনও এক কাগজ বের করার প্ল্যান নিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। আমি একটা স্লান পোস্টকার্ড ছেড়েছিলাম তার উত্তরে। ক্লান্ত গলায় ভদ্রলোক বলে চলেছিলেন, এক স্বপ্নের পত্রিকার গল্প। উনি আমাকে কত কিছু শেখাবেন, আমি এমন ভাল কাজ শিখব যে পড়াশুনো করা অর্থহীন মনে হবে। একটা গুদাম টাইপের ঘর, এলোমেলো অবিন্যস্ত কাগজ ছড়ানো এদিক-ওদিক, যে চেয়ারে বসে ছিলাম, সেটা নড়বড়ে। উল্টোদিকে বসে থাকা মানুষটির জামায় ঘামের দাগ, বিভিন্ন লাঞ্ছনার দাগ মুখের রেখায়, বিড়ি খান লুকিয়ে সামনে সিগারেট, তাই কেমন অদ্ভুত দেখায় সিগারেট ধরানোর ভঙ্গি। আমি শুনে চলেছি এক অসহায় ধারাবিবরণী। আমার বড় বড় হাই উঠছে, ঘুম পাচ্ছে।

পাশাপাশি মজার গল্পও আছে এই রকমের। পাড়ার একজন লোক একটা অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা শুরু করেছিল। জুতো আর টাই পরে বসে থাকত একটা চেয়ারে। পাশে টেলিফোন। দুটো পরিষ্কার জামা ছিল তার। সে দুটো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরত। স্মার্ট হাসিমুখে দু-একজন ক্লায়েন্ট কদাচ এলে তাদের অভ্যর্থনা জানাত। বসতে বলত উল্টোদিকের চেয়ারে। ক্লায়েন্ট সব সময় ঢুকেই দেখত, লোকটি ফোনে কথা বলছে খুব একটা ব্যক্তিত্ব নিয়ে। 'না না, দুপুরে যদি আপনাকে টাইম দিয়ে থাকি তাহলে মনে করুন আমার ডেলিভারি হবে সকালে। অফিস ছোট হতে পারে ম্যাডাম, কিন্তু সারা কলকাতায় আমার দু-ডজন লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে রাউন্ড দ্য ক্লক, আপনার মতো ক্লায়েন্টদের স্যাটিসফাই করার জন্য। হা হা হা। ইয়েস ম্যাডাম, আপনার বারো হাজারের চেকটা অ্যাকাউন্টে এসে গিয়েছে, হ্যাঁ, প্লাস অ্যাডভান্স দিয়েছিলেন ক্যাশ দু-হাজার, বাকিটা ডেলিভারিম্যানের কাছে দিয়ে দেবেন, ওকে ? ইট'স মাই প্লেজার, ম্যাডাম, বাই'।

সামনে বসে থাকা ক্লায়েন্ট বিশেষত ম্যাডামের সঙ্গে এরকম কথাবার্তা শুনে কিছুটা তটস্থ হতেন। টাকা-পয়সার হিসেব শুনে একটু চিন্তিত হয়ত বা। তিনি লক্ষ করতেন না যে এই ব্যবসায়ী উঠে দাঁড়াচ্ছে না পায়ে মোজা নেই বলে বা মোজা ছেঁড়া বলে। টেলিফোনের লাইন যে টেবিলেই শেষ হয়েছে, এটাও অলক্ষ্য থেকে যেত। এই প্রতারক, কোনও কারণে যার নাম ছিল সন্নেসি, এভাবে সামান্য রোজগার করত। বেলা বারোটার পর ওই আশ্চর্য অফিস বন্ধ করে সে তার নড়বড়ে টালির চালের বাইরে নোংরা পুকুরে 'চুরা লিয়া' গাইতে গাইতে স্নান করত। মাঝে-মধ্যে ধরা পড়ে খুব অনুতপ্ত হয়ে স্যরি বলে দিত। ওকে চড়-চাপড়ের বেশি কাউকে মারতে দেখিনি। একজন টাইটা রেগে কেড়ে নেওয়ায় সে বলে, 'ওটা কিন্তু ধাঙরের কাছে থেকে পেয়েছি এক টাকা দিয়ে, ময়লা ফেলার গাড়ি থেকে। স্যরি।'

ওকে অনেকদিন সকালে আমি পুকুরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে দেখেছি। একটা

ছোট্ট হাফ-প্যান্ট পরে কী দেখত কে জানে। কেউ যাতায়াতের পথে 'ও সন্নেসি' বলে হাঁক পাড়লে ভীষণ রেগে যেত। বসে থেকেই চেঁচাত, 'তোর বাপ সন্নেসি।' আবার ডুবে যেত পুকুর দেখায়। আমার মনে হত, ও স্বপ্ন দেখছে। সেন্ট্রাল এভিনিউ-র অন্ধকার ভদ্রলোক এক রকম করে, ও আর এক রকম করে। হয়তো ওর সত্যি ইচ্ছে ছিল ওরকম একটা ব্যবসার, ঠিক যে কোনও ভাবে টাকা উপার্জনের নয়। কারণ তাহলে ও পানের দোকান দিতে পারত, ওর মতো পড়াশোনা আর শ্রেণীচরিত্র নিয়ে যেভাবে ওর অনেক বন্ধু দিয়েছিল। গন্ডগোলের পথে নেমে যেতে পারত, যেমন করছিল ওর অনেক বন্ধু। তা না করে এই বিশেষ কাজটিতে জড়িয়ে পড়বে কেন ও ? হয়তো পুকুরপাড়ে বসে এই সার্থকতা স্বপ্ন দেখত লোকটা।

তবে এই ধরনের লোক বোধহয় কমে আসছে। পাগল টাইপের লোকই কমে যাচ্ছে বোধহয়। এমন এক বিচিত্র সময়ে বেঁচে আছি আমরা যখন পাখির ডাক শুনলেও লোকে মোবাইল ফোন বের করে দ্যাখে। এত রকমারি রিং টোনের জগতে এই বিভ্রম দেখলে হাসি পায়, পায়ও না। বারান্দা থেকে দেখেছিলাম একদিন। কৃষ্ণচূড়া গাছে অনেক পাখি। নানান আওয়াজ করছে। নীচের রাস্তায় দুটো লোক নিজেদের মোবাইল বের করে সম্ভবত কল নেই দেখে আবার পকেটে রেখে দিল। এমনকী এ ব্যাপারে নিজের ভূমিকা নিয়ে হাসলও না কেউ। নাকি এমনটা সব সময়েই ছিল ? দুজন একই সঙ্গে আকাশের একই দিকে তাকিয়ে কেউ চাঁদ এবং অন্য জন গাছে ঝোলা ডাব দেখত কি ?

ক্লাস টুয়েলভে পড়ার সময় অরূপ নামের একটা ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়। সে নস্যি নিত। তবলা বাজানো শিখেছিল। মাঝে-মধ্যে হাত তুলে আঙুল নাড়িয়ে চালু বাংলা সিনেমার গান, পুরোনো 'আধুনিক' গান, নজরুলের গান দু-এক কলি গেয়ে উঠত বহু পুরোনো, তখনই অবলুপ্ত এক শ্রেণীর মেয়েখোঁজা লোকেদের মতো। গলার স্বর ঝাপসা হয়ে যেতে একটু পরেই। নস্যি নিত বলে সব বোধ হয় ব্লকড ছিল -- নাক, মুখ, স্বর, বুদ্ধি। শুধু এক ধরনের সুরজ্ঞান ছিল। মাঝে মাঝেই বিষন্নতায় ডুবে যেত পুরোনো সেই লোকেদের মতোই। তখন নাকি ওর বাঁচাতে ইচ্ছে করত না। এক কথায়, অরূপ ছিল টোটাল মুরগি। তার টাকায় আমরা মাঝে-মধ্যে খেতাম।

একবার অরূপ এবং আমরা দুই অভাবি এবং সব সময় ক্ষুধাতুর বন্ধু ঢাকুরিয়া ব্রিজের ওপর দিয়ে এক গরমের দুপুরে হেঁটে যেতে বাধ্য হচ্ছিলাম অরূপ সেদিন বাস ভাড়া দিতে রাজি হয়নি বলে। ভেতরটা রাগে গনগন করছিল। এরকম সময় অরূপ ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল এবং মোটামুটি আকাশের দিকে দু-হাত তুলে বলল, 'কী হবে বেঁচে থেকে ?' অন্য বন্ধু, মানে ভাইয়া বলল, 'ঠিক আছে। তাই হবে। আজ তোর মৃত্যুই হোক।' অরূপের হাত ধরে টানতে টানতে আমরা ওকে ফুটপাত থেকে মাঝরাস্তার দিকে নিয়ে যেতে লাগলাম। ভালই ট্র্যাফিক ছিল তখন। অরূপ চিৎকার

করছে, 'না। আমি বাঁচতে চাই।' তাতেও আমরা না থামাতে সে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। আমি পাশ থেকে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করি সে সোনালি-তে দহি-কচুরি খাওয়াবে কিনা। অরূপ রাজি হলে আমি ভাইয়াকে চোখ মেরে বলি, 'ছেড়ে দে। আজ ছেড়ে দে'। যেন আমার অনুনয়েই ভাইয়া একটা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত থেকে সরে এল, এমন বীরোচিত ভঙ্গিতে অরূপের হাত ছেড়ে দিল। এরপর দহি-কচুরি খাওয়ার সময়ও যথেষ্ট গাম্ভীর্য বজায় রেখেছিল ভাইয়া।

ভাইয়া পাশের বাড়িতেই থাকে। ওদের বাড়িতেই জীবনে প্রথম জন্মদিন পালন হয় আমার। আমাদের দুজনেরই জন্ম এক দিনে। মাঝে-মধ্যে মদির আসরে এসব গল্প উঠে আসে। এসবের জন্যেই বেঁচে থাকা। অরূপরা বোঝে না।

পর্ব ২৪

এটাই শেষ পর্ব। নিশ্চিতভাবেই শেষ। গত বছর জুন মাসে যে অপরাহ্নের অনুভূতি বলতে শুরু করেছিলাম বন্ধুরা, স্বভাবতই তার শেষের সম্ভাবনা -- রাফ ড্রাফট -- একটা জায়গায় এসে থেমেছিল। এই সেই যৌবন-বার্ধক্য মধ্যবর্তী চিরস্তব্ধ প্রেয়ারি। মোনোলগের শেষ।

হায়ার সেকেন্ডারি ভদ্রগোছে পাশ করাটা জীবনে একটা বড় মোড় ছিল নিশ্চয়। আরও বড় জগতে ঢুকে পড়ছিলাম পা টিপে টিপে। অনেকেই পরে আমায় বলেছে যে আমার মধ্যে নাকি মোটেই বাঙালপনা নেই। ততদিনে 'তাইলে'র ফাঁদ পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু এই শহুরে শিক্ষিত কলকাত্তাইয়া চরিত্র কোথাও একটা পিছুটান নিশ্চয় রেখে এসেছিল অচেতনে। রেফিউজি জীবনের নিশ্চয় একটা চোরা টান থেকে যায় খোয়ানো ঘরবাড়ির প্রতি। খুব স্মৃতিকাতর লাগে একটা মোড়ে এসে। মাত্র আট বছর তো ওদেশে ছিলাম আমি। তার মধ্যে আবার অনেকটাই অজ্ঞানতায় থাকা। তবে ওই সময় থেকেই হয়তো শুরু হয়ে যায় মিথের অনুপ্রবেশ। এর ওর গল্প, এর ওর চোখের জল, বিস্ময় এসব দেখে, দাওয়া বসে ঘেমো গায়ে এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস লাগলে যেমন চমকে যায় শিশু, তেমন জমতে থাকে অবোধ চেতনা।

গল্পটা শুধু ওই আট বছরের নয়। ওই সময়টাকে নিয়ে পালানো এক সকালে ভিটেয় জ্বলতে থাকা শেষ আঙ্গার দেখে, অনন্ত পালানো আর পালানো। যে সে জায়গায় তো পালাইনি আমরা, এসেছিলাম স্বপ্নের ইন্ডিয়ার কলকাতায়। তাছাড়া মলম মাখানোর মতো প্রবোধ তো ছিলই মনে মনে। সব ঠিক হইয়া যাইব, বাবা ফিরা আইব। ৪০ পেরিয়ে মনে হয় পুব দেশের কোথাও যেন আজও ঠিক বয়ে চলেছে এক আট বছর

সীমায়িত ভিডিও শো। সেখানে আজও ঠিক দেখা-শোনা বোঝা -- না-বোঝা জীবন সিনেমা দেখাচ্ছে ওই আট বছরের নির্দেশকের তৈরি। তাছাড়া বাগচি থেকে উপাধিপ্রাপ্ত চক্রবর্তী পরিবারের বংশবৃক্ষ সম্বন্ধে আমার ধারণাও খুব ধোঁয়াটে। তাতেই বা কী ? কিছুটা কল্পনানির্মাণ আর কিছু বেশি বয়েসের বিশ্লেষণ দিয়েই না হয় লেখা হল অপরাহ্নের এই এলোমেলো সামনে-পেছনে চলা।

কিছুটা গল্প শোনা এর-ওর কাছে, তার মধ্যে কিছু গল্প আবেগের তারতম্য অনুযায়ী বলা। তার সত্যি-মিথ্যে যাচাই করতে গিয়ে অনেক সময় একটা মাঝারি রাস্তা নিতে হয়েছে। আর যেসব আমার নিজের মনে আছে, তা অবশ্যই চোখে দেখা আর কানে শোনা। একই সঙ্গে। গোবিন্দর মুখ, বেলগাছিয়ার ছাতাওয়ালা, পুলিশ হাজত, পল্টুদা, কানপুরের অতুল, বড়জাগুলির চিকেন পক্সে ভোগার দিনগুলো, দক্ষিণ কলকাতায় হাওয়াবদল, সেন্ট্রাল এভিনিউর বিভীষিকা, আবার হঠাৎ এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস মুখের একপাশ পেরিয়ে চলে যাওয়া -- মোটামুটি এসবই তো গল্প বেড়ে ওঠার। পেছনে অনন্ত বহমান একটা ছোট্ট নদী, শৈশবের কাশফুল।

এর বেশি ছিল না কিছু কোথাও। যদি গপ্পো বলতে কিছু থাকে, তাহলে এ-ই সব। এটুকু যাঁরা শুনেছেন, তাঁদের মত জানিয়েছেন বাংলা লাইভে, তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। সত্যি সত্যিই। কারণ, এ আমার যে কোনও গদ্য লেখা নয়, সেসব আমি অনেক লিখেছি, ছাপিয়েছি এতদিন। দুটো উপন্যাস ছাপা হয়েছে সেই কোন '৯৪ সালে। একটা উপন্যাস হারিয়ে গেছিল, যার স্মৃতি এখনও কষ্ট দেয়। কিন্তু অপরাহ্নরেখা ঠিক সেরকম কোনও লেখা নয়। এটা এমন একটা কিছু যা আমার লেখার দরকার ছিল খুব। আত্মজীবনী জাতীয় ভারিক্কি নাম দেব না ওকে, কেন না আমি লেখক বা মানুষ হিসেবে ভারী নই। এটা, বন্ধুরা, মনে করুন একটা পাথার যেটাকে গলানোর দরকার ছিল। আমি কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে।

বাংলালাইভ সম্পাদকের কাছে আমার কৃতজ্ঞত অপরিমেয়। যে সাহায্য, উৎসাহ আমি পেয়েছি তাঁর কাছে তার কোনও তুলনা হয় না। যদিও এই বাক্যবন্ধের প্রত্যেকটি শব্দই পোশাকি, বহুদিন ব্যবহারে পচা এবং সন্দেহজনক, কিন্তু কিছু করার নেই। আমি হাত তুলে দিচ্ছি, অন্য কোনও ভাষা আমি জানি না যা এর পাশাপাশি বেশি স্মার্ট কিন্তু চালাকিমোড়া, খেলা-খেলা, মিথ্যে-মিথ্যে শোনাবে না। এক্ষেত্রে গতানুগতিক ভাষা ব্যবহার করাই আমার কাছে বরং বেশি সঙ্গত। আমি তাই করছি। আবার ধন্যবাদ দিচ্ছি সম্পাদককে।

এই যে গোটা ২৪ পর্ব লিখলাম, জানি না এতে কতটা বলতে পেরেছি সেই সব বন্ধুদের কথা যারা গায়ে পড়ে টিউশন দিয়েছিল বাঁচানোর জন্য অথচ এই উপকারকে একেবারেই আন্ডারলাইন না-করে। একটা-দুটো বই দিয়েছিল একেবারেই ক্যাসুয়াল

ভঙ্গিতে, যেন কী করছে নিজেই বুঝতে পারছে না। ভালবাসত বলেই করেছিল তো। নিশ্চয় সহানুভূতি ছিল, মায়া ছিল আমার জন্য। যে বন্ধুর মা নিয়ম করে দিয়েছিলেন আমার আর তাঁর ছেলের জন্মদিন ঠিক এক মাপকাঠিতে পালিত হবে। নিজেদের চূড়ান্ত দুরবস্থায়ও এই নিয়ম বদলায়নি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত, সেই মা-কে আমি কী বলব ? সেই একই বন্ধুর দিদি, চূড়ান্ত লড়াই করতে করতেও ওরকমই এক বিশেষ দিনে আমাদের দুজনকে টাকা দিয়েছিলেন কিছু খাওয়ার জন্য। আমরা দুজন নিউ সিনেমার পাশের এক হোটেলে চিতল মাছের পেটি আর ভাত খেয়েছিলাম হাপসে-হুপসে, এক রেফিউজি আর এক এমনিতেই গরিব ছেলে। সেই দিদিকেই বা আমি কী বলব ? খাটতে খাটতে ভেঙে পড়ছে সে চোখের সামনে, অথচ কোনও বদল হতে দেয়নি মায়ের নিয়মের, কী বলব তাকে ? ১১ ক্লাসে পড়ার সময় যখন আমাকে মাঝখানে রেখে আলোচনা চলছিল আমাকে খাওয়াবে কে, তা নিয়ে, তখন আমার নিতান্তই দুর্বল ছোট চাকুরে ছোড়দার মৃদু গলায় এ-কথা বলা যে আমি তার সঙ্গেই থাকব, একবারও এ-কথা না-বলা যে সে আমাকে খাওয়াবে, এই জাতীয় বিরাট মহানুভবতা দেখেছি আমি। আমি দেখেছি ওই ছোড়দারই স্ত্রী বৌদির আমাকে সব সময় আগলে চলা, একেবারে আর্থিক ক্ষমতা না-থাকার ব্যাপারটা আদর আর ভালবাসা দিয়ে পুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। একেবারে চেনাশোনা সাধারণ মানুষের মধ্যে এত যত্ন দেখেছি, যে দাঁড়িপাল্লায় মাপলে আমি তো বলব, ওই আঠেরো বছর বয়স পর্যন্ত, অনেক পেয়েছি। এর কাছে ম্লান হয়ে যায় আমাকে ভাগাভাগির সময়ের নিষ্ঠুরতা, আমার কান্না, আমার হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করার পর আমার সহপাঠীর বাবার অত্যন্ত ক্ষুন্ন হয়ে মার্কশিটের ট্রু কপি অ্যাটেস্ট করে দেওয়ার নীচতা যেন তিনি এক ক্রিমিনালকে নিতান্তই বাধ্য হয়ে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। তাঁর ছেলের পরীক্ষায় অত্যন্ত খারাপ ফল করার ফল ছিল সেটা। এই সব অপমানবোধ ম্লান হয়ে যায় আশপাশের অন্য মানুষদের ভাবলে, যারা ভাগ্যিস সংখ্যাগুরু। এই সব অপমান এবং উদারতার লড়াইয়ের শেষ কিন্তু এখানে নয়। এ চলতে থাকবে আরও বহু বছর, আমার তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত, কম করে। আমি বিশ্বাস করি জিতেছে ভালবাসাই। এত সব কিছুকে আমি কী ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাব ? যে মাসিমার ঘরে বসে একদিন দেখেছিলাম এক দুপুরে নীলিমা সেনের গাওয়া 'চোখের জলের লাগল জোয়ার' শুনে ঝরঝর করে নি:শব্দে কাঁদা। কিন্তু অন্য সময়, সব সময়, হাসিমুখে ছোট্ট-খাট্ট জিনিস খাওয়াতেন আমাকে -- তিলের নাড়ু, মোয়া, একটু পায়েস। কী ভালবেসে তাকাতেন উনি যখন আমি দিক-বিদিক ভুলে খেয়ে চলেছি, হঠাৎ মাসিমার চোখে পড়ায় প্রথমে অস্বস্তি আর তারপর অবাক হয়ে দেখতাম কী অদ্ভুত স্নেহে উনি আমার খাওয়া দেখে চলেছেন। ছেলে বড় হয়ে গোগ্রাসে গিললে বাবা-মার যে কী তৃপ্তি তা তখনও বুঝিনি ভাল করে।

এই সব সবই আমার বিকেলের অনুভূতিগুচ্ছ। আমার মনে হয় না নতুন করে আর কিছু শুরু হতে পারে আমার ব্যক্তিজীবনে। হোক বা না হোক, এই লেখার শেষে

একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলছি। অনেকটা তো বলা হয়ে গেল। ঠিক কখন যে শুরু হয় বিস্মৃতিবেলার বলা তো যায় না। হয়তো একদিন হঠাৎ অতীত চোখ টিপে পুকুরের অতলে ডুব দেবে। আমি বসে থাকব থুম হয়ে। ভাবতে গেলে এলোমেলো পথে হারিয়ে গিয়ে আর ফিরে আসতে পারব না বর্তমানে। হয়তো এসব হবে অনেক বছর পরে। মাথায় প্যারালিসিস বা ও জাতীয় অসুখ না হলে ৪৫ বছরে পৌঁছে এত দুর্ঘটনার সম্ভাবনা অন্তত আগামী বহু বছর নেই। তবু স্বস্তিবোধ সত্যি। যেন অনেকক্ষণ চেনা পুকুরের গভীরে কাটিয়ে এই মাথা তুললাম। জলজ গুল্ম সরিয়ে তাকালাম আকাশের দিকে। দেখলাম সূর্যও একই বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

পোড় খেলে নাকি মানুষ বেশি বিবেচক হয়। প্র্যাকটিকাল হয় বেশি। ওরকম কিছু আমার হয়েছে বলে তো মনে হয় না। আমি আজও বেহুদা রোমান্টিক। এখনও মুহূর্তের প্রেমে পড়ে আছি। এই লেখাটা মনে করুন এক রেফিউজি মুহূর্ত আলেখ্য। এর বেশি কোনও কথা নেই। সবাইকে ভালবাসা এবং শুভেচ্ছা।

||মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত||ই-বুক||

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
Suman_ahm@yahoo.com